প্রাথমিক বিজ্ঞান

ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে
চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

প্রাথমিক বিজ্ঞান

ইবতেদায়ি

চতুর্থ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা- ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[পরীক্ষামূলক সংস্করণ]
প্রথম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর, ২০২৫

লেখক

প্রফেসর আহমদ ওবায়দুস সাত্তার ভূইয়া
প্রফেসর মাফরুহা নাজনীন
প্রফেসর ড. ইরম জাহান
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ নূরুল বাশার
প্রফেসর ড. জুলফিকার হাসান খান
মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
শাহিনা ইয়াসমিন
সঞ্জীব কুমার বর্মণ
মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ

চিত্রাঙ্কন

জহিরুল ইসলাম ভূঞা সেত
সৃজন সৌরভ ভূঞা

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স

জহিরুল ইসলাম ভূঞা সেত

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

জাতীয় জীবনে ইবতেদায়ি শিক্ষা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ইবতেদায়ি শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা এবং বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ইবতেদায়ি স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে ইবতেদায়ি স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর প্রদান করা হয়েছে।

ইবতেদায়ি শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নত বিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অংশীজনের চাহিদা এবং মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সর্বশেষ ২০২৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর)-এর প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসমূহ ইতোমধ্যে পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এনসিটিবি ইবতেদায়ি স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক শিশুদের দেহ ও মনের সুষম বিকাশে সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

চতুর্থ শ্রেণির 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের সময়ে পূর্ব-শ্রেণির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণিতে সাধারণত নয় বছরের অধিক বয়সের শিশুরা পাঠ গ্রহণ করে। বয়সের কথা বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তকে শিখন বিষয়ের উল্লম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে যেন সক্ষম হয়, সে চেষ্টা করা হয়েছে। চারটি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকেই তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন, চূড়ান্তকরণ এবং সমন্বয় কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, চিত্রশিল্পী এবং ইনডিজাইনারসহ যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্তকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. শিক্ষার্থী-শিক্ষকবান্ধবঃ

- শিখনের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর বুদ্ধির স্তর বিবেচনায় রেখে বিন্যস্ত করা হয়েছে।
- বিষয়বস্তু নির্বাচনে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- শ্রেণি উপযোগী, সহজ ও সাবলীল ভাষায় বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে।
- স্পষ্ট শিরোনাম, উপশিরোনাম এবং পর্যাপ্ত রঙিন ছবি/চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।
- বিজ্ঞানের বিমূর্ত বিষয়গুলোকে রঙিন ছবি/চিত্র এবং যথাযথ বর্ণনার মাধ্যমে বোধগম্য উপায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- কিছু প্রতীক ব্যবহার করে বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করা হয়েছে।
- শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টি ও চিন্তামূলক কাজে উৎসাহিত করার জন্য দুটি চরিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।
- প্রতিটি অধ্যায়সংশ্লিষ্ট নতুন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রঙিন ও মোটা অক্ষরে লেখা হয়েছে।
- পাঠ্যপুস্তকের শেষে শব্দকোষ সংযুক্ত করা হয়েছে, যেখানে বিজ্ঞানের নতুন শব্দগুলোর সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

২. অনুসন্ধানমূলক এবং সক্রিয় শিখনে গুরুত্ব প্রদানঃ

- অনুসন্ধানমূলক, সমস্যা সমাধানভিত্তিক এবং সক্রিয় শিখনে গুরুত্ব প্রদানের জন্য প্রতিটি পাঠ একটি মূল প্রশ্ন বা Key Question এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে।
- প্রতিটি কাজ বা পরীক্ষণের শেষে কাজের সারসংক্ষেপ বা পরীক্ষার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে।
- সারসংক্ষেপ/ফলাফলের শেষে 'আরও কিছু জানি' শিরোনামের আলোকে পর্যাপ্ত তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীর শিখন দৃশ্যমান করা, শিখনদক্ষতা উন্নয়ন এবং সক্রিয় শিখন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিখন সংগঠক (গ্রাফিক অর্গানাইজার) সংযোজন করা হয়েছে।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরীক্ষণ-সংশ্লিষ্ট সহজলভ্য বিকল্প উপকরণ ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- শিক্ষার্থীর সুবিন্যস্ত এবং সূক্ষ্মচিন্তন দক্ষতার বিকাশের জন্য পাঠ্যপুস্তকে কোডিং বিষয়টি সংযোজন করা হয়েছে।

৩. শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে গুরুত্ব প্রদানঃ

- হাতে-কলমে কাজের পর্যাপ্ত সুযোগ রাখা হয়েছে যার মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা যেমনঃ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, তুলনাকরণ, পরিমাপকরণ ইত্যাদি অর্জনে সহায়ক।
- শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা, প্রকাশ করার ক্ষমতা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের জন্য দলগত এবং জোড়ায় আলোচনামূলক কাজের প্রবর্তন করা হয়েছে।

সূচিপত্র

অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-১: জীবের বৃদ্ধি ও প্রজনন	১ - ১১
অধ্যায়-২: স্বাস্থ্য সুরক্ষা	১২ - ২৫
অধ্যায়- ৩: দুর্ঘটনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা	২৬ - ৩৬
অধ্যায়-৪: পদার্থ	৩৭ - ৫২
অধ্যায়-৫: শক্তি	৫৩ - ৬৬
অধ্যায়-৬: গতি ও বল	৬৭ - ৭১
অধ্যায়-৭: প্রাকৃতিক সম্পদ	৭২ - ৮৯
অধ্যায়-৮: মহাবিশ্ব	৯০ - ১০৮
অধ্যায়-৯: আবহাওয়া	১০৯ - ১২৫
অধ্যায়-১০: তথ্য ও প্রযুক্তি	১২৬ - ১৩৮
অধ্যায়-১১: সমস্যা সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৩৯ - ১৪৮
শব্দকোষ	১৪৯ - ১৫১

চরিত্র ও প্রতীক

১) চরিত্র	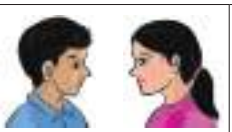 কাব্য কেয়া	তোমার বিজ্ঞান শিখনে কাব্য এবং কেয়া কিছু ইঙ্গিত অথবা ধারণা দেবে। এসো আমরা একসঙ্গে বিজ্ঞান শিখি।
২) প্রতীক	কাজ: সাবধান হও:	এসো আমরা পর্যবেক্ষণ করি, অনুসন্ধান করি এবং পরীক্ষা করে দেখি। নিরাপদ থাকার জন্য চলো আমরা সতর্কতার সাথে কাজ করি।

অধ্যায় ১

জীবের বৃদ্ধি ও প্রজনন

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বেঁচে থাকা এবং ভালোভাবে বৃদ্ধির জন্য পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান প্রয়োজন হয়। এই অধ্যায়ে আমরা উদ্ভিদ জন্মানো, বেঁচে থাকা এবং বৃদ্ধির জন্য যা প্রয়োজন সে সম্পর্কে জানব।

১. বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম

বীজ থেকে নতুন চারাগাছ জন্মানোর প্রক্রিয়াই হলো **অঙ্কুরোদ্‌গম**। উদ্ভিদের প্রজননের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো অঙ্কুরোদ্‌গম।

? উদ্ভিদ জন্মানো ও বেঁচে থাকার জন্য কী কী প্রয়োজন?

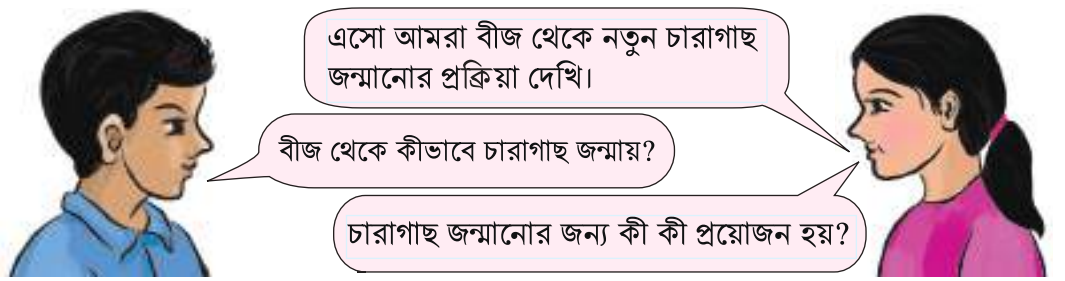

কাজ: বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম পরীক্ষা

১. নিচের ছবিটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি এবং ছকটি পূরণ করি

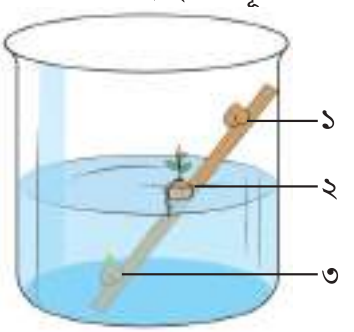

ছোলা বীজ	কী হলো	কেন হলো
বীজ ১		
বীজ ২		
বীজ ৩		

২. পূরণ করা ছকটি পাশের সহপাঠীর সাথে মিলিয়ে নিই। বীকারে পানি নিয়ে কাজটি নিজেরাও করি।

সারসংক্ষেপ

পর্যবেক্ষণে দেখা গেল, প্রথম বীজটি তাপ, আলো ও বাতাস পেয়েছে, কিন্তু পানির অভাবে অঙ্কুরিত হয়নি। দ্বিতীয় বীজটি তাপ, আলো, বাতাস ও পানি পেয়ে ভালোভাবে অঙ্কুরিত হয়েছে। তৃতীয় বীজটি শুধু পানি পেয়েছে, প্রয়োজনীয় তাপ, আলো ও বাতাস না পাওয়ায় ভালোভাবে অঙ্কুরিত হয়নি। বীজ থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মানো অর্থাৎ অঙ্কুরোদ্‌গমের জন্য পরিবেশের তাপ, আলো, বাতাস ও পানি প্রয়োজন। এই উপাদানগুলোর যে কোনো একটির অনুপস্থিতিতে যথাযথভাবে অঙ্কুরোদ্‌গম হয় না।

২. উদ্ভিদের বৃদ্ধি

উদ্ভিদের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও শক্তি খাদ্য থেকে আসে। খাদ্য গ্রহণ করে উদ্ভিদ ধীরে ধীরে ছোটো থেকে বড়ো হয়। উদ্ভিদ নিজের খাদ্য তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করে।

? উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য কী কী প্রয়োজন?

কাজ: উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান খুঁজে বের করা

যা করতে হবে:

১। চারাগাছসহ তিনটি টব তৈরি করি।

২। নিচে দেখানো চিত্রের মতো করে টব তিনটি সাজাই। টব -১ এবং টব -২ সূর্যের আলোতে রাখি। টব -৩ কাঠের বা মোটা কাগজের তৈরি বাক্সের সাহায্যে ঢেকে দিই।

৩। টব-১ ব্যতীত টব-২ এবং টব-৩-এ প্রতিদিন পানি দিই।

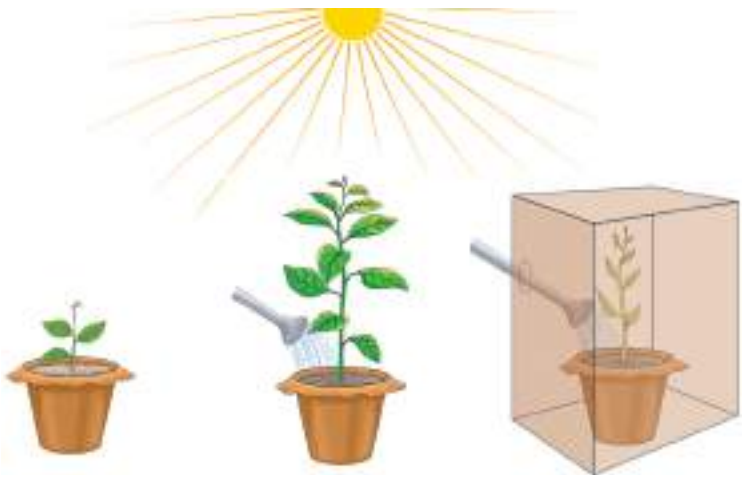

টব-১ টব-২ টব-৩

(বিশেষ নির্দেশনা: যদি কোনো কারণে কাজটি করা সম্ভব না হয় তাহলে উপরের চিত্র দেখে প্রাপ্ত তথ্য ছকে লিখি।)

৪। কয়েক সপ্তাহ পর তিনটি টবের চারাগাছের বৃদ্ধির তুলনা করি।

টব	উপাদান	পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য
১	সূর্যের আলো ও বায়ু আছে	
২	সূর্যের আলো, বায়ু ও পানি সবই আছে	
৩	সূর্যের আলো নেই কিন্তু বায়ু ও পানি আছে	

৫। কাজ শেষে যা পেলাম উপরের ছকে লিখি।

৬। কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

৭। আলোচনার শেষে নিচের প্রশ্নটির উত্তর লিখি।

উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য কী কী উপাদান প্রয়োজন?

সারসংক্ষেপ

পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা জানলাম, প্রথম টবের উদ্ভিদ সূর্যের আলো ও বায়ু পেয়েছে। কিন্তু পানি পায়নি, তাই বৃদ্ধি হয়নি। দ্বিতীয় টবে সূর্যের আলো, বায়ু ও পানি পাওয়ায় উদ্ভিদটির ভালোভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। তৃতীয় টবের উদ্ভিদ পানি পেয়েছে কিন্তু সূর্যের আলো ও বায়ু না পাওয়ায় যথাযথ বৃদ্ধি পায়নি। অর্থাৎ সূর্যের আলো, বায়ু ও পানি না পেলে উদ্ভিদের যথাযথ বৃদ্ধি হয় না।

উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য সূর্যের আলো, পানি এবং বায়ু প্রয়োজন। খাদ্য তৈরির সময় উদ্ভিদ বায়ু থেকে **কার্বন ডাই অক্সাইড** ও পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও শক্তি পেয়ে থাকে। উদ্ভিদ শ্বাসকার্যের জন্য বায়ু থেকে **অক্সিজেন** গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে। বৃদ্ধির সাথে সাথে এক পর্যায়ে গাছে ফুল ফোটে ও ফল ধরে।

৩. সপুষ্পক উদ্ভিদের ফুল, ফল ও বীজ

আমরা তৃতীয় শ্রেণিতে জেনেছি কিছু উদ্ভিদের ফুল ও ফল হয় না। এরা হলো অপুষ্পক উদ্ভিদ। আবার কিছু উদ্ভিদের ফুল ও ফল হয়। এদের সপুষ্পক উদ্ভিদ বলা হয়। সপুষ্পক উদ্ভিদের ফুল হতে ফল ও বীজ হয়।

? ফুল ও ফলের অংশগুলো কী কী?

ফুল এক ধরনের রূপান্তরিত পাতা। আমাদের বাড়ি ও বিদ্যালয়ের আশেপাশে বিভিন্ন ধরনের ফুল ফোটে। এগুলো বিভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে। যেমন- লাল, সাদা, হলুদ, বেগুনি ইত্যাদি। কোনো কোনো ফুলে সুগন্ধ থাকে।

চলো, আমরা ফুলের কী কী অংশ আছে, তা পর্যবেক্ষণ করি।

কাজ: ফুলের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ ও এদের কাজ চিহ্নিত করা

যা করতে হবে:

১। একটি ফুলের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করি। খাতায় ফুলটির ছবি আঁকি।

২। খাতায় আঁকা ফুলের ছবির সাথে শিক্ষকের দেখানো ফুল অথবা ফুলের চিত্রের তুলনা করি এবং ফুলের বিভিন্ন অংশের কাজ নিয়ে দলে আলোচনা করি।

৩। ফুলের বিভিন্ন অংশের কাজ সম্পর্কে চিন্তা করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

ফুলের বিভিন্ন অংশের কাজ	ফুলের সংশ্লিষ্ট অংশের নাম
ফুলের অন্যান্য অংশকে রক্ষা করে	
ডিম্বক ধারণ করে	
ফুলকে সুন্দর দেখায়	
পরাগরেণু উৎপন্ন করে	

৪। পূরণ করা ছকটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

সারসংক্ষেপ

ফুলের বিভিন্ন অংশ আছে। প্রতিটি অংশের নির্দিষ্ট কিছু কাজ রয়েছে।

ফুলের বিভিন্ন অংশ ও ফল সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

ফুলের বিভিন্ন অংশ

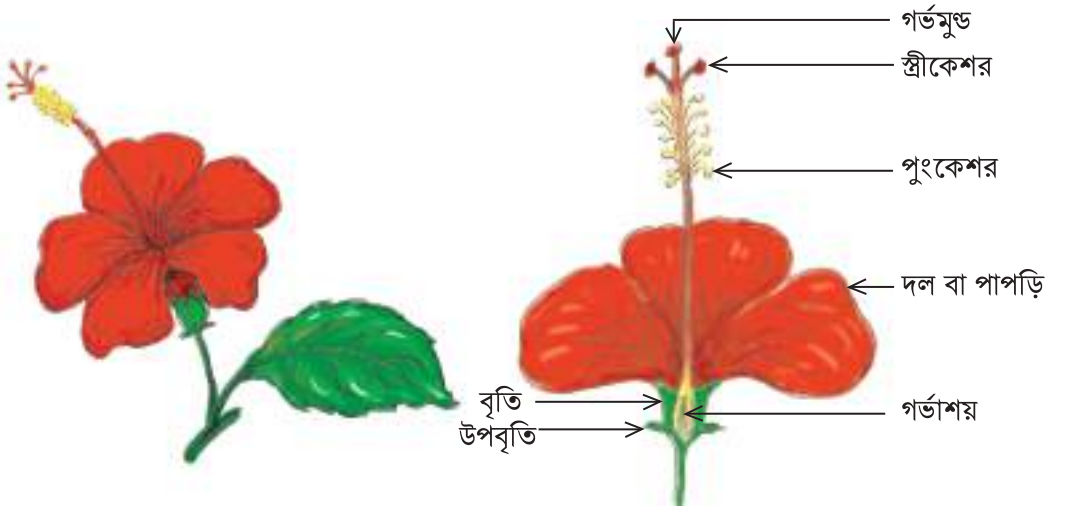

ফুলের বিভিন্ন অংশ

বৃতি

বৃতি সাধারণত সবুজ, দেখতে অনেকটা পাতার মতো। এটি ফুলের সবচেয়ে বাইরের অংশ। কুঁড়ি অবস্থায় বৃতি ফুলের অন্যান্য অংশকে রোদ, বৃষ্টি ও পোকামাকড় থেকে রক্ষা করে।

দলমণ্ডল

বাইরে থেকে ভিতর দিকে ফুলের দ্বিতীয় উজ্জ্বল ও রঙিন অংশ হলো দল বা পাপড়ি। কতগুলো পাপড়ি মিলে দলমণ্ডল গঠন করে। দলমণ্ডল রঙিন হওয়ায় পোকামাকড় ও পশুপাখি আকর্ষণ করে এবং পরাগায়ন নিশ্চিত করে।

পুংস্তবক

এক বা একাধিক পুংকেশর নিয়ে পুংস্তবক গঠিত। এটি ফুলের অত্যাবশ্যকীয় অংশ। পুংকেশর এর দণ্ডের মতো অংশকে পুংদণ্ড এবং শীর্ষের থলির মতো অংশকে পরাগধানী বলে। পরাগধানীর মধ্যে পরাগরেণু উৎপন্ন হয়। পরাগরেণুর মধ্যে থাকে পুরুষ কোষ। পোকামাকড় ও পশুপাখির গায়ে লেগে এক ফুলের পরাগরেণু অন্য ফুলের স্ত্রী কেশরের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে পরাগায়ন বলে।

স্ত্রীস্তবক

এটি ফুলের অত্যাবশ্যকীয় অংশ। এক বা একাধিক গর্ভপত্র বা স্ত্রীকেশর নিয়ে একটি স্ত্রীস্তবক গঠিত হয়। একটি গর্ভপত্রের তিনটি অংশ রয়েছে। যথা- গর্ভাশয়, গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড। গর্ভাশয়ের ভিতরে ডিম্বক থাকে। ডিম্বক হলো স্ত্রী কোষ।

ফল ও বীজ

স্ত্রীকেশরের গর্ভাশয়ের ভিতরে থাকে ডিম্বক। ডিম্বক হলো স্ত্রী কোষ। পরাগরেণুর পুরুষ কোষ গর্ভাশয়ের ডিম্বকের সাথে মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে নিষেক। নিষেকের পর গর্ভাশয়টি ফলে এবং ডিম্বকটি বীজে পরিণত হয়।

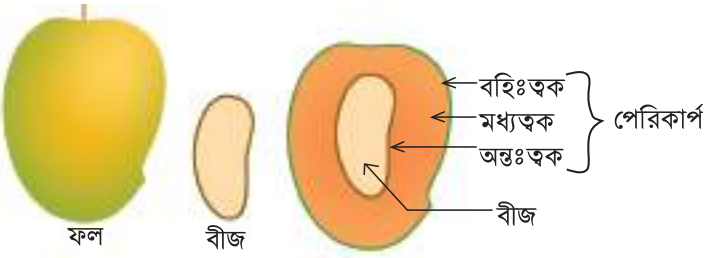

ফলের বিভিন্ন অংশ

ফলের দুটি অংশ রয়েছে। যেমন- পেরিকার্প এবং বীজ। পেরিকার্পের তিনটি স্তর রয়েছে। যেমন- বহিঃত্বক, মধ্যত্বক ও অন্তঃত্বক।

বহিঃত্বক হলো ফলের খোসা। এটি ফলের ভিতরের অংশসমূহকে রক্ষা করে।

মধ্যত্বক সাধারণত রসালো, এটি আমরা খাই। এতে ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে।

অন্তঃত্বক দিয়ে বীজ ঢাকা থাকে। বীজের উপরে পাতলা আবরণই অন্তঃত্বক।

সব ফলেরই কি বীজ থাকে?

কাজ: পরিচিত ফলে বীজের উপস্থিতি চিহ্নিতকরণ

যা লাগবে: পরিচিত বিভিন্ন ফল (যেমন– আম, জাম, পেঁপে, তরমুজ, কলা, কাঁঠাল ইত্যাদি)

যা করতে হবে:

১। পরিচিত কয়েক ধরনের ফল সংগ্রহ করে শিক্ষকের সহায়তায় ছুরি দিয়ে কাটি।

২। ফলের খোসা থেকে শুরু করে ভিতরের অংশ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করি।

৩। বিভিন্ন ফলের অভ্যন্তরীণ অংশ পর্যবেক্ষণ শেষে নিচের ছকটি পূরণ করি।

ফলের নাম	ফলে বীজের উপস্থিতি (আছে/নেই)	বীজের সংখ্যা (একটি/অল্প/অনেকগুলো)

সারসংক্ষেপ

বেশিরভাগ ফলে বীজ থাকে। কোনো ফলে একটিমাত্র বীজ থাকে, আবার কোনো ফলে অনেক বীজ থাকে।

৪. সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবনচক্র

পরাগায়ন ও নিষেকের পর নিষিক্ত ডিম্বক থেকে বীজ হয় এবং পুরো গর্ভাশয়টি ফলে পরিণত হয়। বীজ থেকে অনুকূল পরিবেশে নতুন চারাগাছ জন্মায়।

সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবনচক্র

চারাগাছ ধীরে ধীরে বড়ো হয়, পরিণত গাছে ফুল ও ফল ধরে। সকল সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবনকালে এই ধাপসমূহ পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। জীবনব্যাপী পর্যায়ক্রমে বা চক্রাকারে চলতে থাকা ধাপসমূহই হলো জীবনচক্র। মরিচ, টমেটো, আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি উদ্ভিদের ফুল ও ফল হয় এবং ফলে বীজ থাকে।

কাজ: গাছের জীবনচক্রের ধাপসমূহ চিহ্নিতকরণ

যা করতে হবে:

১। উপরের চিত্রটি নিয়ে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করি। চিত্রটিতে জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায় চিহ্নিত করি।

৫. প্রাণীর জীবনচক্র

আমরা উদ্ভিদের জীবনচক্র সম্পর্কে জেনেছি। প্রাণীর জীবনকালে কি একই রকম ধাপ রয়েছে?

কাজ: মুরগির জীবনচক্রের ছবি আঁকা

যা করতে হবে:

১। এসো আমরা মুরগির জীবনচক্রের ছবি আঁকি।

২। আঁকা ছবিটি নিয়ে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করি।

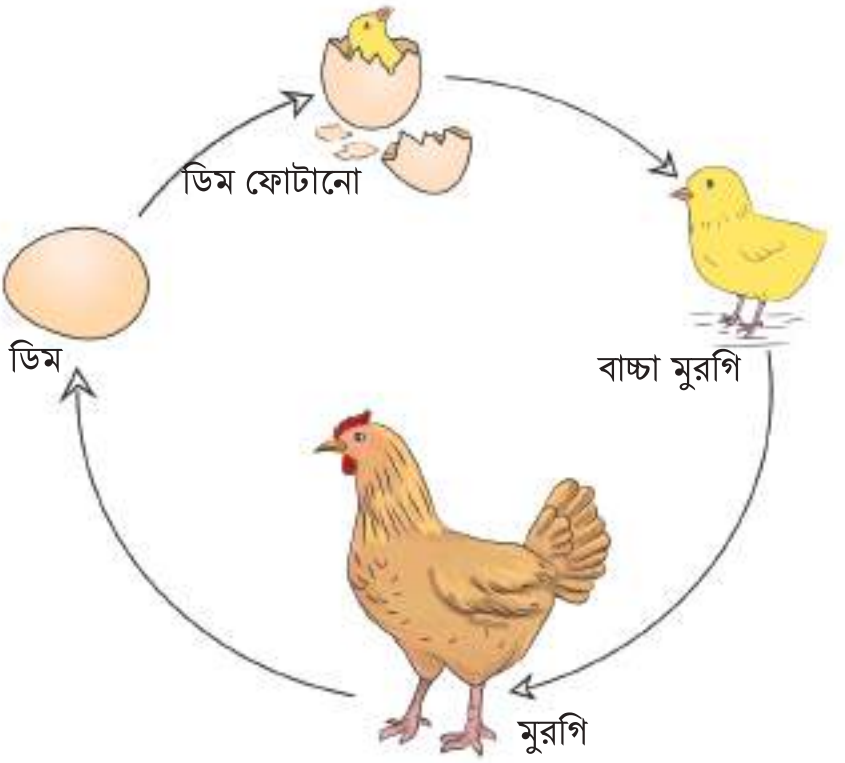

প্রাণীর জীবনচক্র

সারসংক্ষেপ

আমরা জানলাম, ডিম থেকে বাচ্চা হয় এবং বাচ্চাটি ধীরে ধীরে বড়ো হয়। বড়ো মুরগি আবার ডিম পাড়ে। এভাবে চক্রটি চলতে থাকে। হাঁস, কবুতর, টিয়া, ময়না, কাক, কোকিল, ইত্যাদি পাখিও ডিম পাড়ে।

কাজ: উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনচক্রের তুলনা

যা করতে হবে:

নিচে একটি মরিচ গাছ এবং মুরগির জীবনচক্রের ছবি দেওয়া হলো।

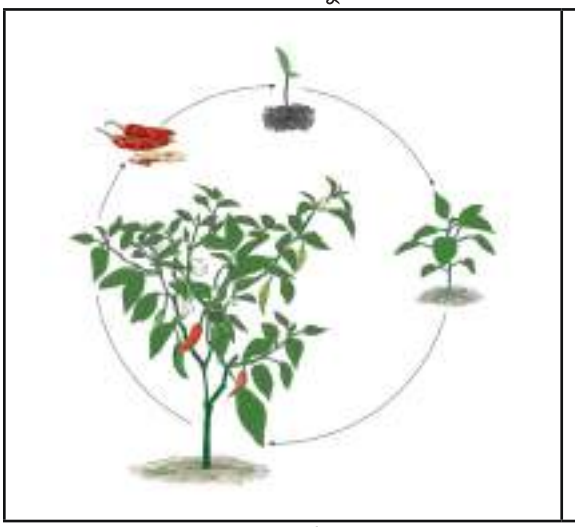

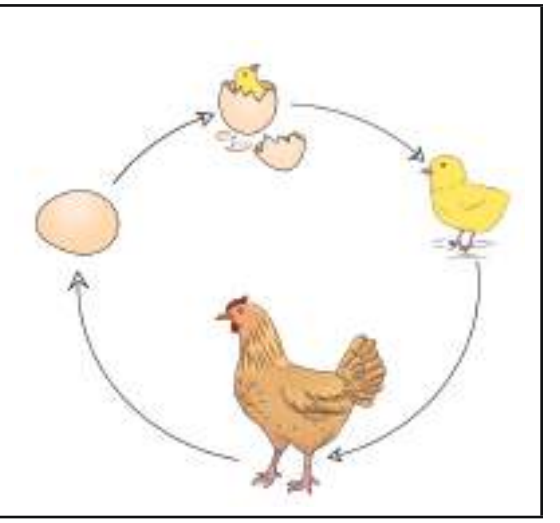

১। ছবি দুটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি।

২। মরিচ গাছের জীবনচক্রের সাথে মুরগির জীবনচক্রের মিল খুঁজে বের করি।

৩। কাজটি নিয়ে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

মরিচ গাছ ও মুরগির জীবনচক্রের তুলনা	
মরিচ গাছ	মুরগি

সারসংক্ষেপ

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল জীব একটি নির্দিষ্ট জীবনচক্র অতিক্রম করে। জীবের জন্ম হয়, এরা বৃদ্ধি পায় ও বংশবিস্তার করে। এক সময় এদের মৃত্যু হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপের মধ্যে মিল রয়েছে। যেমন– উদ্ভিদের বীজ এবং মুরগির ডিম। ডিম অথবা বীজ যথাক্রমে মুরগি বা উদ্ভিদের জীবনচক্র শুরুর ধাপ। কিন্তু মানুষ, গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ডিম পাড়ে না। তারা সরাসরি বাচ্চা জন্ম দেয়। এই বাচ্চা থেকেই তাদের জীবনচক্র শুরু হয়। তবে বাচ্চা জন্ম দিলেও এদের জীবনে ডিমের ভূমিকা রয়েছে। পরবর্তী শ্রেণিতে আমরা সে সম্পর্কে জানব।

জীবের প্রজনন সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

আমরা ইতোমধ্যে জীবের জীবনচক্র সম্পর্কে জেনেছি। আমরা দেখেছি জীবনচক্রের কোনো এক পর্যায়ে জীব থেকে অনুরূপ নতুন জীবের সৃষ্টি হয়। নতুন জীব সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াই হলো প্রজনন।

প্রাণীর বংশবৃদ্ধি

প্রজননের গুরুত্ব

জীব মাত্রই মরণশীল। জীবের শুধু মৃত্যু হলে পৃথিবী থেকে এক সময় সকল জীব বিলীন হয়ে যেত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। একদিকে জীবনচক্রের শেষ পর্যায়ে জীবের যেমন মৃত্যু ঘটে, তেমনি অন্য কোনো পর্যায়ে প্রজননের মাধ্যমে তার মতো আরেকটি জীবের জন্ম হয় এবং এরা সংখ্যায় বাড়ে। প্রজনন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জীব তার প্রতিরূপ সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎ বংশধর রেখে যায়। এভাবেই বছরের পর বছর জীব নিজের পরিবেশে টিকে আছে।

অনুশীলনী

১. শূন্যস্থান পূরণ করি

ক) জীব মাত্রই --------- গ্রহণ করে।

খ) খাদ্য তৈরির জন্য উদ্ভিদের -------- পানি ও বায়ু প্রয়োজন।

গ) ফুলের উজ্জ্বল ও রঙিন অংশ হলো ----------।

ঘ) বীজ থেকে নতুন ---------- হয়।

২. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দেই

১) খাদ্য তৈরি করার সময় উদ্ভিদ কী ত্যাগ করে?

ক) অক্সিজেন খ) নাইট্রোজেন

গ) কার্বন ডাইঅক্সাইড ঘ) জলীয়বাষ্প

২) জীবের শক্তি কোথা থেকে আসে?

ক) বায়ু খ) পানি

গ) মাটি ঘ) খাদ্য

৩) ফুলের কোন অংশ কুঁড়ি অবস্থায় অন্যান্য অংশকে রক্ষা করে?

ক) বৃতি খ) দল

গ) পুংকেশর ঘ) স্ত্রীকেশর

৩. শুদ্ধ বাক্যে 'শু' এবং অশুদ্ধ বাক্যে 'অ' লিখি।

ক) উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে।

খ) গাছের পাতায় পরাগরেণু উৎপন্ন হয়।

গ) শ্বাস গ্রহণের সময় উদ্ভিদ অক্সিজেন গ্রহণ করে।

৪. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক) উদ্ভিদের কোন অংশে বীজ থাকে?

খ) বীজ থেকে চারাগাছ জন্মাতে কী কী প্রয়োজন হয় ?

৫. বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক) ফুলের বিভিন্ন অংশের কাজ চিত্রসহ বর্ণনা করো।

খ) বাড়ির পাশের আম গাছ ও তোমার নিজের পোষা বিড়ালটির জীবনচক্রে কোথায় কোথায় মিল আছে চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।

অধ্যায় ২

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী, সুস্বাস্থ্য বলতে শুধু অসুখ না থাকাকে বোঝায় না; বরং একই সঙ্গে শরীর, মন ও সামাজিক দিক থেকে ভালো থাকাকে বোঝায়। যা কিছু আমাদেরকে শারীরিক, মানসিক বা সামাজিকভাবে সমস্যায় ফেলে এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনে বিঘ্ন ঘটায় তা রোগ। আমরা যাতে রোগে না ভুগি এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারি সেজন্য কিছু নিয়ম মেনে চলা উচিত। এই অধ্যায়ে আমরা শারীরিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করব।

১. বিভিন্ন ধরনের রোগ

? সাধারণত আমরা কী কী রোগে আক্রান্ত হই?

কাজ: রোগের তালিকাপ্রস্তুতকরণ

যা করতে হবে

১. এ পর্যন্ত আমি কী কী রোগে আক্রান্ত হয়েছি, একটু ভেবে তা তালিকা আকারে লিখি।

২. আমাদের অনেকেরই পরিবারে বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি আছেন। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে যেসব রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, সে রোগগুলোর নামও তালিকায় যুক্ত করি।

৩. এবার সহপাঠীদের তৈরি করা তালিকাটি দেখি।

৪. নিজের তালিকায় নেই এমন রোগগুলোর নামও তালিকায় যুক্ত করি।

নিজে আক্রান্ত হওয়া রোগের নাম	পরিবারের অন্যান্য সদস্য আক্রান্ত হওয়া রোগের নাম	অন্যান্য রোগের নাম

৫. কয়েকজন সহপাঠী বন্ধু শিক্ষকের সামনে গিয়ে কয়েকটি রোগে আক্রান্ত হবার অবস্থা অভিনয় করে দেখাই।

৬. বন্ধুদের অভিনয় দেখে নতুন যেসব রোগের নাম পেলাম তা নিজের তালিকায় যুক্ত করি।

৭. নিচের ছবিগুলো দেখি এবং কোনটি কোন রোগের লক্ষণ তার নাম ছবির নিচে লিখি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

সারসংক্ষেপ

আমরা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রোগে আক্রান্ত হই। সেগুলোর কয়েকটি হল- সর্দি, কাশি, বসন্ত, চোখ উঠা, রাতকানা, ডায়রিয়া, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি। যেকোনো রোগই আমাদের কষ্ট দেয়।

২. রোগের শ্রেণিকরণ

আমরা যেকোনো সময় রোগে আক্রান্ত হতে পারি। বিভিন্ন কারণে রোগ হতে পারে। কোনো কোনো রোগ একজন থেকে আরেকজনের হতে পারে। সাধারণত অনুজীবের দ্বারা রোগ সৃষ্টি হয়। আবার কোনো অঙ্গের গঠন বা কাজ করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেলেও আমরা রোগাক্রান্ত হই।

রোগের কারণের উপর ভিত্তি করে রোগকে নানাভাবে শ্রেণিকরণ করা হয়।

? রোগ কত ধরনের?

কাজ: রোগের শ্রেণিকরণ

যা করতে হবে:

১। সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

একজন থেকে অন্যজনের হয়, এমন রোগের নাম	একজন থেকে অন্যজনের হয় না, এমন রোগের নাম

সারসংক্ষেপ

সংক্রামক রোগ

কিছু কিছু রোগ একজনের থেকে আরেকজনে ছড়ায় সেগুলোকে সংক্রামক রোগ বলে। সংক্রামক রোগগুলো ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক বা অন্য কোনো পরজীবীর কারণে হয়ে থাকে। যেমন: সর্দি, চোখ ওঠা, বসন্ত, করোনা, হাম ইত্যাদি।

অসংক্রামক রোগ

কিছু কিছু রোগ একজনের থেকে আরেকজনের হয় না। সাধারণত শরীরের কোনো অঙ্গের কর্মক্ষমতা হ্রাস বা বিপাকীয় কার্যক্রম বাধা পেলে মানুষ এ ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। এদেরকে বলে অসংক্রামক রোগ। যেমন–হৃদরোগ, রাতকানা, আলঝেইমার, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, মানসিক রোগ ইত্যাদি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী **মাদকাসক্তি**ও একটি রোগ।

সংক্রামক রোগের শ্রেণিকরণ সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

সাধারণত বায়ু, পানি বা প্রাণী সংক্রামক রোগের জীবাণু বহন করে এবং রোগের বিস্তার ঘটায়। বিস্তারের মাধ্যমের উপর ভিত্তি করে এ রোগগুলো নানা নামে পরিচিত। যেমন–

পানিবাহিত রোগ: পানির মাধ্যমে যে সব রোগ ছড়ায় সেগুলোকে পানিবাহিত রোগ বলে। যেমন– ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস-এ ইত্যাদি।

বায়ুবাহিত রোগ: বায়ুর মাধ্যমে যেসব রোগ ছড়ায় সেগুলোকে বায়ুবাহিত রোগ বলে। যেমন– ইনফ্লুয়েঞ্জা, ফুসফুসের যক্ষ্মা, কোভিড-১৯ ইত্যাদি।

প্রাণিবাহিত রোগ: কোনো কোনো রোগের জীবাণু প্রাণীরাবহন করে, এদের প্রাণীবাহিত রোগ বলে। যেমন– মশার মাধ্যমে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু, ইঁদুরের মাধ্যমে প্লেগ এবং কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগ ছড়ায়।

কাজ: বায়ু, পানি ও প্রাণিবাহিত রোগ শনাক্তকরণ

যা করতে হবে:

১। নিজে ভেবে ও সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

গ্যাসের মাধ্যমে ছড়ায় এমন রোগ	পানি মাধ্যমে ছড়ায় এমন রোগ	প্রাণীর মাধ্যমে ছড়ায় এমন রোগ

৩. রোগের কারণ ও বিস্তার

কী কী কারণে আমাদের রোগ হয়?

কাজ: বিভিন্ন রোগের কারণ খুঁজে বের করা

যা করতে হবে:

১। নিজের অভিজ্ঞতা ও জানা থেকে নিচের ছকটি পূরণ করি।

২। সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে ছকে রোগের আরও কারণ যুক্ত করি।

রোগের নাম	রোগের কারণ

সারসংক্ষেপ

সংক্রামক রোগের কারণ

বিভিন্ন কারণে মানুষ রোগাক্রান্ত হতে পারে। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি সংক্রামক রোগের কারণ হলো বিভিন্ন রোগের জীবাণু। এসব জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে রোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং রোগীর কাছাকাছি থাকলে অথবা জীবাণু দ্বারা দূষিত পানি পানে রোগ হতে পারে। আবার কখনো কখনো জীবাণু বহনকারী পোকামাকড় বা প্রাণীর মাধ্যমে রোগ হতে পারে। অনেক সময় পুষ্টিহীনতার কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এর ফলে মানুষ রোগে আক্রান্ত হয়।

অসংক্রামক রোগের কারণ

সাধারণত পরিবেশের নানা উপাদান, যেমন– পানি, বায়ু প্রভৃতি দূষিত হবার কারণে মানুষের রোগ হয়। শারীরিক পরিশ্রম না করাও কিছু অসংক্রামক রোগের জন্য দায়ী। বায়ু দূষণ ও অন্যান্য পরিবেশ দূষণের কারণে **চর্মরোগ**, অ্যাজমা ইত্যাদি রোগ হয়। ধূমপান ও মাদকদ্রব্য গ্রহণে ক্যান্সার, হৃদরোগসহ বিভিন্ন অসংক্রামক রোগ হতে পারে। **বংশগত** কারণেও বেশ কিছু অসংক্রামক রোগ হতে পারে। কখনো আবার ভিটামিনের অভাবেও রোগ হয়। যেমন- ভিটামিন এ-এর অভাবে রাতকানা ও ভিটামিন ডি-এর অভাবে রিকেটস রোগ হয়। **স্বাস্থ্যকর** ও সুষম নয় এসব খাবার খেলে; জীবন-যাপনে অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের কারণেও রোগ হতে পারে।

সংক্রামক রোগ কীভাবে বিস্তার লাভ করে?

রোগ একজন থেকে আরেকজনের দেহে ছড়ানোই হলো রোগের বিস্তার। বিভিন্ন মাধ্যমে সংক্রামক রোগ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহ হতে সুস্থ মানুষের দেহে ছড়ায়। সাধারণত বিভিন্ন মাধ্যমে রোগের জীবাণু বিস্তার লাভ করে। যেমন জীবাণু দ্বারা দূষিত পানি পান বা ব্যবহার করলে পানিবাহিত রোগ হয়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হাঁচি-কাশি ও কথাবার্তা বলার সময় বায়ুবাহিত রোগের জীবাণু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং সুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে।

ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া রোগের জীবাণু বহন করে মশা। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে কামড়ানোর পর ঐ মশা সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে সেই ব্যক্তির এসব রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে। এভাবেই মশার মাধ্যমে অনেক রোগের জীবাণু একটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক ও ইঁদুরের কামড়ে প্লেগ রোগ হয়। অর্থাৎ মশা, ইঁদুর, কুকুরসহ আরও কিছু প্রাণীর মাধ্যমে অনেক রোগের জীবাণু বিস্তার লাভ করে।

ডেঙ্গু রোগের বিস্তার

কোনো কোনো সময় রোগীর সংস্পর্শে এলে ঐ রোগের জীবাণু সরাসরি আরেকজন সুস্থ মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়তে পারে। যেমন– চর্মরোগ। এছাড়াও রক্তের মাধ্যমেও বিভিন্ন সংক্রামক রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে।

৪. রোগের লক্ষণ

প্রতিটি রোগের আলাদা আলাদা লক্ষণ রয়েছে। কোনো রোগে আক্রান্ত হলে আমাদের শরীর ও আচরণে যে পরিবর্তন হয়,তা-ই ঐ সব রোগের লক্ষণ। এসব লক্ষণ দেখে আমরা রোগটিকে চিনে থাকি।

বিভিন্ন রোগের সাধারণ লক্ষণগুলো কী কী?

দলগত কাজ: লক্ষণ দেখে রোগ চেনা

যা করতে হবে:

১। কয়েকটি কাগজের টুকরা নিই এবং টুকরায় একটি করে রোগের নাম লিখি।

২। শ্রেণিতে কয়েকটি দলে ভাগ হই।

৩। প্রতিটি দল একটি করে কাগজের টুকরা নিই।

৪। তুলে নেয়া কাগজের টুকরায় লেখা রোগটির লক্ষণ নিয়ে দলের মধ্যে আলোচনা করি।

৫। কাগজে লেখা রোগটি কখনো নিজের হয়ে থাকলে, সে অভিজ্ঞতাও এখানে যুক্ত করি।

৬। ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে লক্ষণগুলো উপস্থাপন করি।

৭। নিজ ও অন্য দলের উপস্থাপন দেখে বিভিন্ন রোগের লক্ষণগুলো নিচের ছকে লিখি।

রোগের নাম	লক্ষণসমূহ

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন রোগের সাধারণ লক্ষণগুলো হলো–

- সর্দি হলে নাক দিয়ে অনবরত তরল পড়তে থাকে, নাক লাল হয়ে যায়।
- চোখ উঠা রোগ হলে চোখ লাল হয়ে যায়, চোখে চুলকানি ও জ্বালা অনুভূত হয় । চোখে **পিচুটি** জমা হয়ে পাতা আটকে যায়।
- ডায়রিয়া হলে ঘনঘন পাতলা পায়খানা হয়। অতিরিক্ত পিপাসা পায়। পেট ব্যথা করে। শরীর পানিশূন্য হয়ে চামড়া কুঁচকে যায়। রোগী আস্তে আস্তে নিস্তেজ হতে থাকে।
- ম্যালেরিয়া জ্বরে কিছু সময় পরপর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। মাথা ও পেটসহ সারা শরীর ব্যথা করে ও বমি বমি ভাব হয়।
- অ্যাজমা রোগে শ্বাসকষ্ট হয়, শ্বাসের সাথে শোঁ শোঁ শব্দ হয়। ।
- ডায়াবেটিস রোগীর ঘনঘন পানির পিপাসা পায়, বার বার প্রস্রাব হয়, শরীরের ওজন কমতে থাকে।
- ফুসফুসের যক্ষ্মা রোগ হলে দীর্ঘমেয়াদি কাশি থাকে, কাশির সাথে মাঝে মাঝে রক্তপাত হয়। বুকে ব্যথা হয়, ওজন কমতে থাকে। সাথে জ্বরও থাকে।

৫. রোগের প্রতিকার

জীবনের বিভিন্ন সময়ে আমরা নানা রোগে আক্রান্ত হই। রোগ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য যা যা করা হয়, তাই ঐ রোগের প্রতিকার।

রোগের প্রতিকারে করণীয়গুলো কী কী?

কাজ: রোগের প্রতিকারে করণীয়গুলো বের করা

যা করতে হবে:

১। নিজে ভেবে ও সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে যা যা করা হয়

২। এবার আমরা কয়েকজন নিজেদের লেখাগুলো পড়ে শ্রেণির সবাইকে শোনাই।

৩। অন্য সবার পড়া শুনে, নিজের লেখায় রোগের প্রতিকারে যে করণীয়গুলো বাদ পড়েছে তা ছকে যোগ করি।

সারসংক্ষেপ

অসুস্থ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ ও পথ্য সেবন এবং পরিমিত বিশ্রাম নিতে হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও রোগের প্রতিকারে অন্যতম পূর্বশর্ত।

রোগের প্রতিকার সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

ডায়রিয়া ও কলেরায় আক্রান্ত রোগীর দেহের পানিশূন্যতা রোধে যথেষ্ট পানীয় বা স্যালাইন পান করাতে হয় । টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া বা অন্য কোনো জ্বরে আক্রান্ত রোগীকে জলপট্টি দিয়ে বা **শরীর স্পঞ্জ** করে দেহের তাপমাত্রা কমিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। রোগীর ব্যবহার্য কাপড়, বিছানা, বাসনপত্র, গ্লাস, কাপ নিয়মিত পরিষ্কার রাখা জরুরি। রোগ অনুযায়ী ঔষধ ও পথ্য সেবন করলে এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিলে সহজে রোগ নিরাময় হয়।

এসব কাজ করার পরও রোগীর অবস্থার উন্নতি না হলে, অবশ্যই **বিশেষজ্ঞ** চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ঔষধ সেবন

স্যালাইন পান করা

জলপট্টি দেওয়া

৬. রোগ প্রতিরোধ

আমরা কেউই রোগাক্রান্ত হতে চাই না। রোগাক্রান্ত না হবার জন্য যে সব সতর্কতা বা সচেতনতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেগুলোই রোগ প্রতিরোধের উপায়।

কীভাবে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করা যায়?

কাজ: রোগ প্রতিরোধের উপায় চিহ্নিতকরণ

যা করতে হবে:

১। বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্ত ও সুস্থ থাকার জন্য আমরা যা যা করি, সেগুলো নিচের ছকে লিখি।

রোগের নাম	সতর্কতামূলক ব্যবস্থা
জ্বর	
ডায়রিয়া	
কাশি	
চোখ উঠা	

২। সহপাঠীদের সাথে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলো আলোচনা করে, ছকে নতুন ধারণাগুলো যুক্ত করি।

সারসংক্ষেপ

রোগজীবাণু সাধারণত বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়ায়। তাই জীবাণু যাতে না ছড়ায় সে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। যেমন– পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, হাঁচি-কাশির সঠিক নিয়ম মানা, সুষম খাদ্য গ্রহণ ও পর্যাপ্ত ঘুমানো ইত্যাদি। এজন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলো অনুশীলন করাও খুব জরুরি। নিজে ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে অনেক রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায় ।

রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে আরও কিছু জানি ...

সংক্রামক রোগ

সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ মানুষ থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখতে হয়। রোগীর কফ-থুথু যেখানে সেখানে না ফেলে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হয়। রোগীকে সেবাদানের সময় প্রয়োজন অনুসারে মাস্ক, কালো চশমা বা গ্লাভস ব্যবহার করা দরকার। সেবাদানকারী ও চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার সময় রোগীকেও মাস্ক পরানো উচিত। রোগীর নিত্য ব্যবহার্য জিনিস ভালোভাবে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ব্যবহার করতে হয়। যে সব প্রাণী রোগ ছড়ায় তাদের থেকে নিরাপদ থাকার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তা ছাড়া বিভিন্ন বয়সে যেসব টিকা রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে, সেগুলো সময়মতো নিতে হবে।

টিকা গ্রহণ

মাস্ক ব্যবহার

গ্লাভস ব্যবহার

অসংক্রামক রোগ

অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবন যাপন করা জরুরি। দূষণমুক্ত নির্মল পরিবেশও রোগ প্রতিরোধের অন্যতম উপায়। তামাকজাত পণ্য ব্যবহার ও ধূমপান থেকে বিরত থাকা; মদ্যপান ও অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ না করা; অস্বাস্থ্যকর ও সুষম নয় এমন খাবার (যেমন: ফাস্টফুড, অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাদ্য ও পানীয়; অতিরিক্ত লবণ ইত্যাদি) গ্রহণ করা; সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করা এবং নিয়মিত শরীরচর্চা (যেমন: শারীরিক খেলাধুলা) করলে বেশিরভাগ অসংক্রামক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। অনেক সময় বংশগত কারণে কারো কারো অসংক্রামক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা শুরু থেকেই বেশি থাকে। সেক্ষেত্রেও স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের মাধ্যমে সে সম্ভাবনা কমিয়ে আনা যায়।

৭. স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাবলি

প্রাত্যহিক জীবনে কিছু নিয়ম মেনে চললে আমরা সুস্থ থাকতে পারব। এতে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়বে।

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কী কী নিয়ম মেনে চলা দরকার?

কাজ: স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলো চিহ্নিতকরণ

যা করতে হবে:

১। উপরের ছবিগুলো দেখে ও সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে নিচের ছকটি পূরণ করি ।

স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাবলি

স্বাস্থ্যকর অভ্যাস অনুশীলন

১। নিচের ছকের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি-

আমি কি সবসময় বিশুদ্ধ পানি পান করি?	
বাড়িতে আমি কী কী খাই?	
আমি কি প্রতিদিন ফল খাই? খেলে কোন ফল খাই?	
স্কুল শেষে বাড়ি ফিরে কী করি?	
প্রতিদিন বিকেলে কী করি?	
নিজেকে পরিষ্কার রাখতে কী কী কাজ করি?	
আমি কি পরিষ্কার পোশাক পরি?	
খাবার খাওয়ার আগে ও শৌচাগার ব্যবহারের পর কী করি?	

২। নিজের লেখা উত্তরগুলো নিজেই পড়ি।

৩। কোন কাজটি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যথাযথ নয় বলে মনে হচ্ছে, তা জেনে নিতে চেষ্টা করি।

সারসংক্ষেপ

সুস্থ ও নীরোগ থাকার জন্য প্রতিদিনের জীবনযাপনের প্রতিটি বিষয়েই কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে।

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাবার পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে। নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলা করা এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া দরকার। নির্মল বায়ু ও সুপেয় নিরাপদ পানি ব্যবহার করা খুবই জরুরি। এসবই স্বাস্থ্য রক্ষার সুঅভ্যাস।

স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

খাওয়ার আগে ও টয়লেট ব্যবহারের পরে, সাবান বা ছাই দিয়ে সঠিক নিয়মে হাত ধুলে রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

অতিরিক্ত তেল-মসলাযুক্ত ও গুরুপাক খাবার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এসব খেলে হজমে সমস্যা হয়, ওজন বেড়ে যায়। ফলে নানারকম রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনাও বাড়ে। তাই আমাদের স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করার অভ্যাস করতে হবে।

প্রতিদিন পরিমাণমতো নিরাপদ খাবার পানি পান করতে হবে। ডাবের পানি, লেবুর শরবত– এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। কোমল পানীয় পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। দৈনন্দিন কাজে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পানি ব্যবহার করতে হবে। দূষিত পানির মাধ্যমে বেশির ভাগ সংক্রামক রোগ ছড়ায়।

প্রতিদিন নিয়মিত শরীরচর্চা, বাইরে খেলাধুলা ও হাঁটাহাঁটি করলে শরীর সুস্থ থাকে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও সুস্বাস্থ্যের অন্যতম ভিত্তি। প্রতিদিন দাঁত মাজা, গোসল করার পাশাপাশি নিজের ব্যবহারের সবকিছু ও চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে হবে। এতে রোগজীবাণুর আক্রমণ কম হয়।

পরিবেশকে নিরাপদ, দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর রাখতে বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে।

নিচের চিত্র থেকে আমরা হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম শিখে নিই।

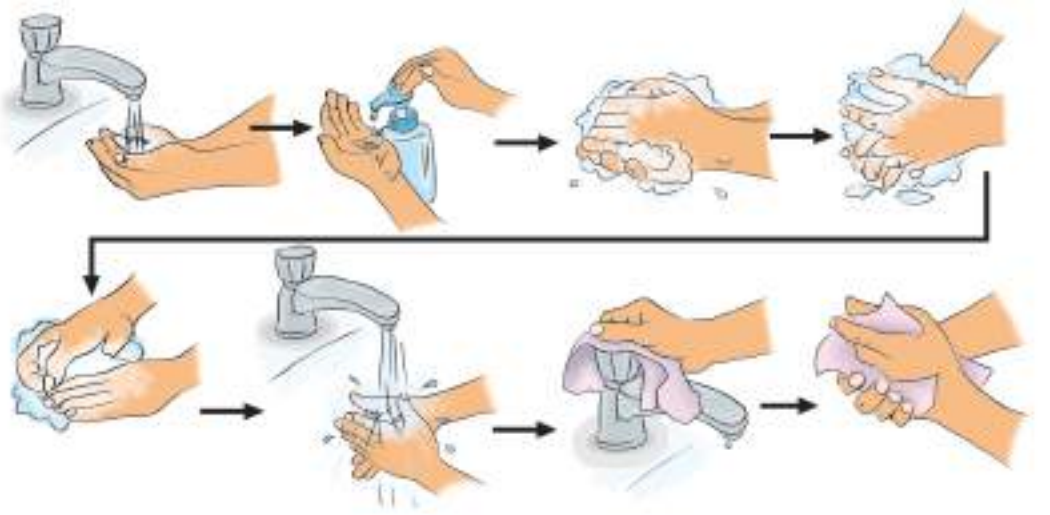

হাত ধোয়ার বিভিন্ন ধাপ

অনুশীলনী

১। নিচের রোগগুলোর নামের সাথে সঠিক কারণ ও লক্ষণ দাগ টেনে মিলাই

রোগের কারণ	রোগের নাম	রোগের লক্ষণ
আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শ	ম্যালেরিয়া	পানি দেখে ভয় পাওয়া
দূষিত পানি পান	জলাতঙ্ক	কাঁপুনি দিয়ে জ্বর
মশার কামড়	ডায়রিয়া	পিচুটিসহ লাল চোখ
ভিটামিন এ-এর অভাব	চোখ উঠা	ঘনঘন পাতলা পায়খানা
কুকুরের কামড়	রাতকানা	রাতে চোখে ভালোমতো না দেখা

২। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিই।

১) নিচের কোনটি সংক্রামক রোগ?

ক) হৃদরোগ খ) ডায়াবেটিস গ) ম্যালেরিয়া ঘ) রিকেটস

২) কোনটি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দরকারি?

ক) প্রতিদিন কোমল পানীয় পান করা খ) নিয়মিত ব্যায়াম করা

গ) মসলাযুক্ত মজাদার খাবার খাওয়া ঘ) রাত জেগে পড়াশোনা করা

৩) অসংক্রামক রোগ সম্পর্কে নিচের কোনটি সত্য?

ক) বংশগতভাবে হয় না খ) নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না

গ) দূষণের ফলে হয় না ঘ) জীবাণুর দ্বারা ছড়ায় না

৩। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক) নিচের রোগগুলোকে বিস্তারের মাধ্যম অনুসারে শ্রেণিকরণ করি–

আমাশয়, ডেঙ্গু, সর্দি, প্লেগ, টাইফয়েড, চোখ উঠা

খ) ডায়রিয়া হলে স্যালাইন খেতে হয় কেন?

গ) অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধের উপায়গুলো কী কী?

৪। বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক) দুটি বায়ুবাহিত রোগের লক্ষণ লিখি।

খ) সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়গুলো কী কী?

গ) দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্য রক্ষার কোন কোন অভ্যাস অনুশীলন করি, তা লিখি।

অধ্যায় ৩

দুর্ঘটনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা

১. দৈনন্দিন জীবনে দুর্ঘটনা

সুস্থ থাকার পাশাপাশি আমাদের দেহের সুরক্ষাও প্রয়োজনীয়। নানা রকম দুর্ঘটনার কারণে আমাদের জীবনের সুরক্ষা নষ্ট হয়।

? আমাদের জীবনে সাধারণত কী কী দুর্ঘটনা ঘটে?

কাজ: দুর্ঘটনার নামের তালিকা তৈরি করা

যা করতে হবে:

১। উপরের চিত্রগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি।

২। নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাগুলো অপর পৃষ্ঠার ছকে লিখি।

৩। এই ছকে আমাদের দেখা দুর্ঘটনাগুলোকে যুক্ত করি।

৪। সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে বাদ পড়া দুর্ঘটনাগুলোও ছকে যোগ করি।

আমার জীবনে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা	আমার দেখা দুর্ঘটনা	অন্যান্য দুর্ঘটনা

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন সময়ে আমাদের জীবনে বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। যেমন–শরীরের কোনো অংশ কেটে যাওয়া, হাড় ভেঙে বা মচকে যাওয়া, আগুনে পুড়ে যাওয়া, সাপে কাটা, পানিতে ডুবে যাওয়া, বিদ্যুতায়িত হওয়া ইত্যাদি।

কাজ: দুর্ঘটনায় ক্ষতি চিহ্নিতকরণ

যা করতে হবে:

১। দুর্ঘটনায় সাধারণভাবে যা যা ক্ষতি হয় সেগুলো নিজে ভেবে ও সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে নিচের ডায়াগ্রামের **শূন্যস্থানে** লিখি।

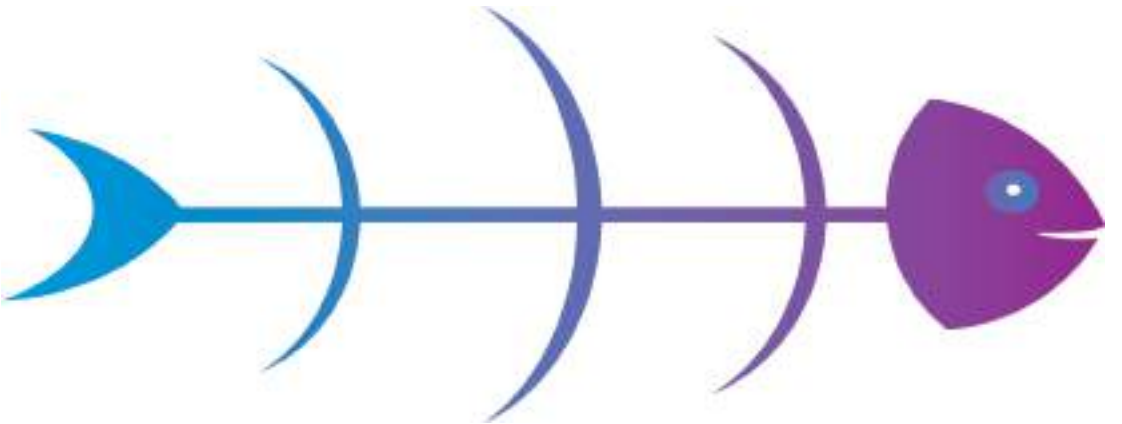

ফিসবোন ডায়াগ্রাম

সারসংক্ষেপ

দুর্ঘটনা আমাদের জীবনের স্বাভাবিকতা ও নিরাপত্তায় ব্যাঘাত ঘটায়। এর ফলে আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। কখনো এতে মৃত্যুর– ঝুঁকিও থাকে।

দুর্ঘটনার ক্ষতি সম্পর্কে আরও কিছু জানি ...

গাছ থেকে পড়ে আঘাত লেগে আমাদের দেহের কোনো অংশ কেটে বা ভেঙে যেতে পারে। ফলে অঙ্গহানি, রক্তপাত, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। পানিতে ডুবে গেলে শ্বাস বন্ধ হয়ে আমরা মৃত্যুর মুখোমুখিও হতে পারি। আগুন লাগলে শরীরের নানা অংশ পুড়ে যায়, গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। সাপের কামড়েও মৃত্যু-ঝুঁকি থাকে। সাপের বিষ রক্তে মিশে গিয়ে শ্বাসকষ্ট ও অঙ্গে পচন সৃষ্টি করতে পারে। রোগীর পক্ষাঘাতও হতে পারে। তড়িতাহত হলে আমাদের দেহের ত্বক, পেশি, স্নায়ু, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের ক্ষতি হয়। এতেও মৃত্যু- ঝুঁকি থাকে। সড়ক দুর্ঘটনায় অঙ্গহানি ঘটে, কখনো মৃত্যুও হয়। দুর্ঘটনামুক্ত থাকতে সতর্কতা জরুরি। সতর্ক থাকলে দুর্ঘটনায় ক্ষতির পরিমাণ কমে আসবে।

২. দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সতর্কতা

আমরা কীভাবে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করতে পারি?

কাজ: দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উপায় চিহ্নিতকরণ

যা করতে হবে:

১। উপরের চিত্রগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি।

২। একটি করে দুর্ঘটনা প্রতিরোধের সতর্কতা নিয়ে দলে আলোচনা করি।

৩। প্রতিটি দলের একজন নিজের দলে আলোচনা করা প্রতিরোধমূলক সতর্কতাগুলো ভূমিকাভিনয় করে দেখাই।

৪। দলের আলোচনা ও সহপাঠীদের ভূমিকাভিনয় দেখে নিচের ছক পূরণ করি।

দুর্ঘটনার ধরন	প্রতিরোধে সতর্কতা
গাছ থেকে পড়া	
আগুনে/তাপে পোড়া	
পানিতে ডোবা	
সড়ক দুর্ঘটনা	
সাপে কাটা	
তড়িতাহত হওয়া	

সারসংক্ষেপ

সতর্ক থাকলে আমরা সহজেই দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে পারি। তাই এই সতর্কতামূলক প্রতিরোধক ব্যবস্থাগুলো জানা ও তা মেনে চলা জরুরি।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধ সম্পর্কে আরও কিছু জানি ...

খেলার সময় আঘাত

এরকম আঘাত থেকে রক্ষা পেতে হলে খেলার সময় অন্যদেরকে দেখে দৌড়াব এবং কাউকে ধাক্কা দিব না। অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে।

কেটে যাওয়া

ছুরি, কাঁচি বা ধারালো কিছু ব্যবহার করতে গিয়ে অনেক সময় আমাদের হাত বা শরীরের কোনো অংশ কেটে যায়। তাই এরূপ আঘাত থেকে বাঁচতে ধারালো বস্তু ব্যবহারের সময় আমরা বড়োদের সাহায্য নিব। এতে শরীরের কোথাও কেটে গিয়ে রক্তপাত হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

গাছ থেকে পড়ে যাওয়া

বৃষ্টির দিনে কখনো গাছে উঠব না। অন্য সময়ও সাবধানে গাছে উঠব, যাতে পড়ে না যাই। গাছে উঠার সময় কাউকে গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে রাখব।

পানিতে ডোবা

আমরা অনেকেই সাঁতার কাটতে ও পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করতে পছন্দ করি। সাঁতার না জানা থাকলে কখনোই পুকুরে, খালে, নদীতে একা একা নামব না বা গোসল করব না। এ সময় অবশ্যই বড়োদেরকে সাথে রাখব। এতে পানিতে ডুবে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না। সাঁতার শিখেও পানিতে ডোবাজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা যায়।

আগুনজনিত দুর্ঘটনা

খালি হাতে গরম কিছু ধরবো না। অনেক সময় বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে যায়। এক্ষেত্রে বাড়ির বৈদ্যুতিক তার ও সংযোগের ব্যাপারে সাবধান থাকব। দিয়াশলাই, জ্বলন্ত বিড়ি বা সিগারেট ও চুলা ইত্যাদি থেকে ঘর-বাড়ি বা স্থাপনায় আগুন লেগে যায়। অগ্নিকান্ডের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে দিয়াশলাই বা আগুনের কোনো উৎস যেমন– কুপি, হারিকেন, মোমবাতি ইত্যাদি নিয়ে খেলব না। সহজে আগুন লাগে এমন কিছু যেমন– কাগজ, কাপড়, কাঠ ইত্যাদি আগুনের কাছ থেকে দূরে রাখব। এ ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কমে যায়।

তড়িতাহত হওয়া

ভেজা হাতে বৈদ্যুতিক জিনিস ধরলে শক লাগতে পারে। একে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া বলে। এটি এড়াতে বড়োদের সাহায্য ছাড়া বা ভেজা হাতে কখনোই বৈদ্যুতিক তার বা কোনো জিনিস ধরব না।

সড়ক দুর্ঘটনা

নিয়ম না মেনে গাড়ি চালানোর ফলে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। সব সময় ডান ও বাম দিক লক্ষ করে, সিগনাল বাতি দেখে সতর্কভাবে রাস্তা পার হব। এতে দুর্ঘটনা বহুলাংশে প্রতিরোধ করা যায়। রাস্তায় জেব্রাক্রসিং অথবা রাস্তার পাশে ফুটপাথ থাকলে অবশ্যই তা ব্যবহার করব।

সাপে কাটা

বাড়িঘরের আশপাশ পরিষ্কার রাখলে সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে না। সাপ থাকতে পারে এমন জায়গা এড়িয়ে চলব। রাতে বাতি ও লাঠি নিয়ে চলাফেরা করলে নিরাপদ থাকব। সাপের খেলা দেখার সময়ও সতর্ক থাকব। বাড়ির আশপাশে ঝোপঝাড় থাকলে তা পরিষ্কার করব, ইঁদুরের গর্ত থাকলে তা ভরাট করব।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এ সতর্কতাগুলো মেনে চললে সহজেই বিভিন্ন দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

৩. দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা

ডাক্তার আসা বা হাসপাতালে নেওয়ার আগে দুর্ঘটনাকবলিত ব্যক্তিকে দ্রুত যে সাময়িক চিকিৎসা দেওয়া হয়, তাই প্রাথমিক চিকিৎসা।

প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু সাধারণ নিয়ম আছে। এগুলো হলো–

১। প্রথমেই বয়সে বড়ো বা জরুরি সেবার কারো কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

২। নিজেকে দুর্ঘটনামুক্ত রাখতে, আহত ব্যক্তিকে সাহায্য করার আগে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিতে হবে।

৩। দুর্ঘটনা– কবলিত ব্যক্তিকে নড়াচড়া না করে স্থির রাখতে হবে।

৪। আহত ব্যক্তিকে ভরসা দিয়ে (তুমি সুস্থ হয়ে যাবে- এটা বলে) শান্ত রাখতে হবে।

এই সাধারণ নিয়মগুলো অনুসরণ করার পর দুর্ঘটনা অনুযায়ী প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হয়।

বিভিন্ন দুর্ঘটনায় কী কী ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসা নিতে হয়?

কাজ: দুর্ঘটনার সাথে সম্পর্কিত প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি শনাক্তকরণ

যা করতে হবে:

১। উপরের চিত্রগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি।

২। একটি করে দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে দলে আলোচনা করি।

৩। প্রতিটি দলের একজন নিজের দলে আলোচনা করা প্রাথমিক চিকিৎসা ভূমিকাভিনয় করে দেখাই।

৪। দলের আলোচনা ও সহপাঠীদের ভূমিকাভিনয় দেখে নিচের ছক পূরণ করি।

দুর্ঘটনার নাম	প্রাথমিক চিকিৎসা
গাছ থেকে পড়া	
আগুনে/তাপে পোড়া	
পানিতে ডোবা	
সড়ক দুর্ঘটনা	
সাপে কাটা	

সারসংক্ষেপ

দুর্ঘটনাকবলিত ব্যক্তিকে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা দিলে তা ঐ ব্যক্তির জীবনহানির সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। তাই আমাদের সবারই কিছু প্রাথমিক চিকিৎসা জানা দরকার।

দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে আরও কিছু জানি ...

- গাছ থেকে পড়ে বা খেলতে গিয়ে বা অন্য কোনোভাবে **আঘাত পেলে** সঙ্গে সঙ্গে আঘাতের জায়গায় বরফ লাগাতে হয়। এসব দুর্ঘটনায় কোনোভাবে হাড় ভেঙে বা মচকে গেলে, ভাঙা হাড়ের নিচে একটা কাঠের টুকরার সাপোর্ট দিয়ে বেঁধে দিতে হবে, এরপর দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার।
- শরীরের কোনো জায়গা **কেটে গেলে**, তা প্রথমে তুলা ও জীবাণুনাশক দিয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর ঐ জায়গা তুলা ও পাতলা কাপড় দিয়ে বেঁধে রক্তপড়া বন্ধ করতে হবে।
- **আগুনে পুড়ে গেলে**, পোড়া জায়গায় ১০ মিনিট পরিষ্কার ও স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানি ঢালতে হবে। তারপর ক্ষতস্থানে তেল বা ক্রিম লাগাতে হবে। কোনোভাবেই যেন ফোসকা না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ফোসকা পড়ে গেলে, তা কখনোই গলানো যাবে না।
- **কারো বৈদ্যুতিক শক লাগলে**, প্রথমেই তাকে বিদ্যুতের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। মেইন সুইচ বন্ধ বা বৈদ্যুতিক প্লাগ খুলে এটা করতে হয়। এ কাজে শুকনো কাঠ বা বাঁশও ব্যবহার করা হয়। প্লাস্টিকের মাদুর, কাঠের টুকরা, মোটা কাগজ বা চটের বাস্তর উপর দাঁড়িয়ে এ কাজটি করতে হয়। এ সময় কোনো বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে ধরা বা ছোঁয়া যাবে না। এতে উদ্ধারকারীও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়বে। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস, নাড়ির স্পন্দন ও ক্ষত পরীক্ষা করে লক্ষণ অনুযায়ী ডাক্তরের কাছে না নেওয়া পর্যন্ত প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।

- **সাপে কাটা** ব্যক্তিকে যথাসম্ভব নড়াচড়া না করে স্থির রাখতে হবে। কাটার ক্ষতস্থান বুকের উচ্চতা থেকে নিচু রাখা জরুরি। কাটা জায়গার একটু উপরে কাপড়ের ফিতা বা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
- কেউ পানিতে **ডুবে গেলে**, ঐ ব্যক্তিকে পানি থেকে উদ্ধার করে, তার শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এগুলো হলো–

পানি থেকে তুলে আনা রোগীকে চিত করে শুইয়ে, পেটে চাপ দিয়ে পানি বের করে নিতে হবে।	
এরপর ডানের ছবির মতো থুতনি উঁচু করে ধরতে হবে।	
এখন রোগীর নাক চেপে ধরে মুখে মুখ লাগিয়ে, তার বুক ফুলে না উঠা পর্যন্ত ফুঁ দিয়ে যেতে হবে।	
তবে মাঝে মাঝে তাকে শ্বাস ছাড়ার সুযোগ ও সময় দেবার জন্য মুখ সরিয়ে নিতে হয়।	
রোগীর বুক কিছুক্ষণের মধ্যে ফুলে না উঠলে, তার মাথার অবস্থান পরিবর্তন করে, আবারও ফুঁ দিতে হবে।	

এরপর ডানে দেখানো ছবির মতো রোগীর বুকের মাঝখানে হাত রেখে ৩০বার নিচের দিকে চাপ দিতে হবে। এ সময় বুকের উচ্চতা যেন এক-তৃতীয়াংশ দেবে যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।	
রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হওয়া ও চিকিৎসকের কাছে না নেওয়া পর্যন্ত, এভাবে ফুঁ দেওয়া ও বুকে চাপ দেওয়া চালিয়ে যেতে হবে।	

প্রাথমিক চিকিৎসা দেবার পর অবশ্যই যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনাকবলিত ব্যক্তিকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা জরুরি।

৪. বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ

স্বাস্থ্যবিষয়ক কোন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে?

কাজ: বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ

যা করতে হবে:

১। কী কী ধরনের আকস্মিক অসুস্থতা হতে পারে তা নিয়ে দলে আলোচনা করি।

২। এ লক্ষণগুলো দেখা গেলে কোন ধরনের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে তা লিখি।

লক্ষণ	বিশেষজ্ঞের ধরন
বুকে ব্যথা ও চাপ অনুভব করা, শ্বাসকষ্ট ও ঘাম হওয়া	হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ

সারসংক্ষেপ

দুর্ঘটনা বা আকস্মিক রোগ দেখা দিলে যে কোনো ক্ষেত্রেই নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালের চিকিৎসক/বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। দুর্ঘটনা ছাড়াও কোনো সুস্থ ব্যক্তি হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলেও সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া দরকার।

বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ বিষয়ে আরও কিছু জানি...

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন রোগের লক্ষণ সম্পর্কে জেনেছি। দুর্ঘটনা যেমন হঠাৎ করে ঘটে তেমনই কিছু কিছু রোগও হঠাৎ করে প্রকাশ পায়। দুর্ঘটনা বা আকস্মিক অসুস্থতা উভয় ক্ষেত্রেই চিকিৎসক/ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

আমরা কিছু কিছু আকস্মিক রোগের লক্ষণ সম্পর্কে জেনে রাখতে পারি। যা আমাদের দ্রুত চিকিৎসা নিতে সাহায্য করবে।

- হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলে, ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে জ্ঞান না ফিরলে নিউরোলজিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হবে।
- বুকের বাম পাশে ব্যথা, বুকে চাপ অনুভব করা, শ্বাসকষ্ট, সহজে হাঁপিয়ে যাওয়া ও ঘাম হলে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে পারি।
- হঠাৎ করে কথা জড়িয়ে গেলে, মুখ বেকে গেলে বা মানুষ চিনতে না পারলেও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখাতে পারি।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করি:

ক) দুর্ঘটনামুক্ত থাকতে ---------- জরুরি।

খ) ---------- না জানলে পানিতে নামব না।

গ) ---------- নিয়ে খেলা বিপজ্জনক।

ঘ) দুর্ঘটনা- কবলিত ব্যক্তিকে ---------- রাখতে হবে।

ঙ) প্রাথমিক চিকিৎসা ---------- সম্ভাবনা কমায়।

২। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিই।

১) কোনটি দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি নয়?

ক) রক্তপাত খ) বদহজম গ) অঙ্গহানি ঘ) মৃত্যুঝুঁকি

২) কোন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন?

ক) বৃষ্টি ভিজে সর্দি হলে খ) খাবার বদহজম হলে

গ) খেলার সময় সামান্য আঘাত পেলে ঘ) বুকে ব্যাথার সাথে ঘাম হওয়া

৩) ফানুস নিয়ে অসাবধানে খেললে কোন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে?

ক) আগুনজনিত খ) আঘাতজনিত গ) বিষক্রিয়াঘটিত ঘ) রক্তপাতঘটিত

৩। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক) কয়েকটি দুর্ঘটনার নাম লিখি।

খ) কেউ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে কী করতে হয়?

গ) প্রাথমিক চিকিৎসা বলতে কী বোঝায়?

৪। বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক) প্রাথমিক চিকিৎসার সাধারণ নিয়মগুলো কী কী?

খ) পানিতে ডোবা ব্যক্তিকে কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হয়?

গ) দুর্ঘটনামুক্ত থাকতে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়?

অধ্যায় ৪

পদার্থ

১. পদার্থের বৈশিষ্ট্য

খেলনা থেকে শুরু করে বাতাস, পানি সবকিছুই পদার্থ। কিন্তু সব পদার্থ কি এক রকম? নিশ্চয়ই না। কখনো কি ভেবেছ কেন বল লাফ দেয়? কেনইবা নদীর পানি বয়ে যায়? এসবের পেছনের কারণ পদার্থগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য। পদার্থের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোকেই পদার্থের ধর্ম বলা হয়।

তৃতীয় শ্রেণিতে আমরা দেখেছি, একগ্লাস পানিতে পাথর ফেললে পানির উচ্চতা বাড়ে। এভাবে কঠিন পদার্থের একটি বৈশিষ্ট্য আমরা খুঁজে বের করেছিলাম- তা হলো আয়তন। কঠিন পদার্থ জায়গা দখল করে। দখলকৃত জায়গাকে ঐ বস্তুর আয়তন বলে। কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকৃতি থাকে। কঠিন পদার্থের মতো তরল পদার্থেরও আয়তন আছে। তরল পদার্থকে যে পাত্রে রাখা হয়, তার আকৃতি ধারণ করে। তরল পদার্থ এক স্থান হতে অন্য স্থানে গড়িয়ে যেতে পারে।

? কঠিন ও তরল পদার্থের কী কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে?

কাজ ১: পদার্থের ওজন আছে তা বোঝার জন্য সরল পরীক্ষণ।

যা প্রয়োজন: একটি কাঠি বা স্কেল (৩০ সে.মি. বা তার বেশি), একটি পেন্সিল বা কলম, দুটি একই ধরনের কাগজের বা প্লাস্টিকের কাপ, কিছু পয়সা বা ছোট পাথর, সুতা, কাঁচি ও টেপ।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

যা করতে হবে:

১. প্রয়োজন অনুযায়ী সমান দৈর্ঘ্যের দুই টুকরা সুতা নিই।

২. সুতা দুটো দিয়ে দুটো হালকা প্লাস্টিকের বা কাগজের কাপের (বা ছোট পাত্র) মুখ এমনভাবে বেঁধে নিই যেন পরে এগুলো সহজে খোলা যায়।

৩. একটি রুলার স্কেলের দুই প্রান্তে কাপ দুটো এমনভাবে বেঁধে দিই যেন স্কেলটি ব্যালান্স করা যায় ।

৪. স্কেলের মাঝ বরাবর আরেকটি সুতা দিয়ে বাঁধি এবং সেটিকে একটি পেন্সিল বা কলমের উপর এমনভাবে রাখি যেন স্কেলটি দোল খায় এবং ভারসাম্য পর্যবেক্ষণ করা যায়।

৫. স্কেলটি শুরুতে সোজাভাবে (আনুভূমিকভাবে) আছে কি না তা লক্ষ করি। যদি না থাকে, কাপের জায়গা বা সুতা সামান্য সরিয়ে ভারসাম্য আনি।

৬. এখন বাম পাশে একটি মুদ্রা রাখি এবং স্কেল কোন দিকে ঝুঁকে পড়ে তা দেখি।

৭. ডান পাশে ধীরে ধীরে ছোটো পাথর রেখে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনি।

৮. এখন বাম পাশে তরল দ্বারা অর্ধপূর্ণ করি। ডান পাশে ধীরে ধীরে ছোটো পাথর রেখে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনি।

সারসংক্ষেপ

স্কেল ও কাপ দিয়ে বানানো নিক্তির এক পাশে একটি মুদ্রা অথবা পানি রাখলে দেখা যায় স্কেলটির যে পাশে বস্তু রাখা হয়েছে সেই দিকে ঝুঁকে পড়ে। এরপর অন্য পাশে পাথর রেখে ভারসাম্য আনা হয়। এই কাজের মাধ্যমে বোঝা যায়– মুদ্রা বা পানির মতো জিনিসের অর্থাৎ কঠিন ও তরল পদার্থের ওজন আছে।

কাজ ২: পদার্থ চাপ প্রয়োগে বাধা প্রদান করে।

যা করতে হবে–

১. একটি দেয়ালে ধাক্কা দিই।

২. সুই ছাড়া একটি সিরিঞ্জ নিই।

৩. এবার সিরিঞ্জটিতে পানি প্রবেশ করিয়ে সিরিঞ্জটির মুখ আঙুল দিয়ে বন্ধ করি। পিস্টন দিয়ে ধীরে ধীরে চাপ দিই।

৪. নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করি।

- চাপ প্রয়োগে কী ঘটে?
- বাধা প্রদান করেছে কি?

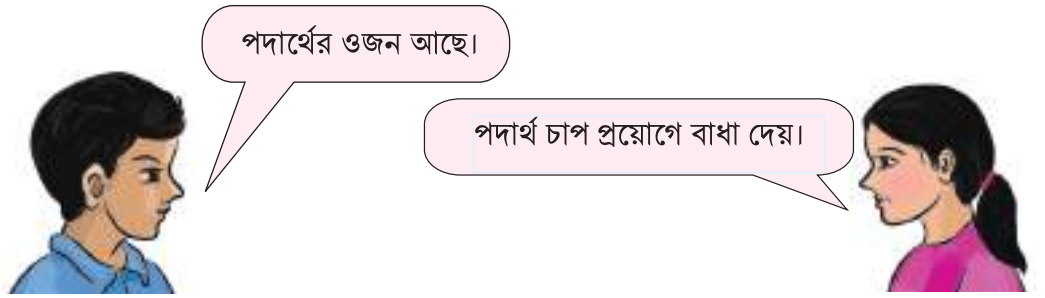

সারসংক্ষেপ

কঠিন বস্তুতে (যেমন দেয়াল) ধাক্কা দিলে তা সহজে নড়ে না। বরং আমরা একটি প্রতিরোধ অনুভব করি। এর অর্থ হলো, কঠিন পদার্থ চাপ বা ধাক্কার বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করে। সিরিঞ্জের মুখ বন্ধ করে যখন ভেতরের দিকে চাপ দেওয়া হয়, তখন পিস্টন সহজে নামতে চায় না। কারণ ভেতরে থাকা পানি বাধা দেয়। ফলে আমরা বুঝি, পদার্থের একটি বৈশিষ্ট্য হলো–পদার্থকে চাপ প্রয়োগ করলে বাধা প্রদান করে।

বায়বীয় পদার্থের বৈশিষ্ট্য

আজকে আমরা বায়বীয় পদার্থ (যেমন– বাতাস বা বায়ু)– এর ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব।

? বায়বীয় পদার্থের কী কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে?

কাজ: বায়বীয় পদার্থের বৈশিষ্ট্য শনাক্তকরণ

যা যা দরকার: সুতা, একটি রুলার স্কেল, একই উৎস থেকে সংগ্রহ করা দুটি নতুন পলিথিনের ব্যাগ অথবা দুটি বেলুন।

যা করতে হবে:

১. প্রয়োজন অনুযায়ী সমান দৈর্ঘ্যের দুই টুকরা সুতা নিই।

২. সুতা দিয়ে দুটি পলিথিনের ব্যাগের মুখ আলতোভাবে এমন করে বাঁধি যাতে পরে সহজেই খুলে ফেলা যায়।

৩. একটি রুলার স্কেলের দুই প্রান্তে পলিথিনের ব্যাগ দুটি এমনভাবে বাঁধি যেন এটিকে সহজেই এপাশে-ওপাশে নাড়াচাড়া করা যায়।

৪. রুলার স্কেলের মাঝ বরাবর আরেকটি লম্বা সুতার টুকরো দিয়ে বাঁধি এবং এটিকে একটি উঁচু স্থান থেকে ঝুলিয়ে দিই।

৫. দেখা যাবে যে রুলার স্কেলটি যেকোনো একটি দিকে ঝুঁকে পড়েছে। পলিথিন ব্যাগের বাঁধনের যে অংশটি রুলারের সাথে আছে তা এমনভাবে নাড়াচাড়া করি যেন রুলার স্কেলটি আনুভূমিক হয়।

যেকোনো একদিকের একটি চুপসানো পলিথিনের ব্যাগ খুলে ফেলি এবং দু হাত দিয়ে পলিথিনের মুখ প্রসারিত করে নাড়াচাড়া করে এটির মধ্যে বাতাস প্রবেশ করাই। বাতাস– ভর্তি ব্যাগটির মুখ বেঁধে ঝুলন্ত রুলারের আগের জায়গায় সুতা দিয়ে আটকাই। (রুলারের যে সুতাটি ছিল তাই ব্যবহার করব।)

কী ঘটে লক্ষ করি।

বাতাস ভরা ব্যাগটির গায়ে হালকা চাপ দিয়ে দেখি কী ঘটে।

পর্যবেক্ষণের আলোকে নিচের ছকটি পূরণ করি।

পর্যবেক্ষণ ছক	
পলিথিনের ব্যাগটি কীভাবে ফোলানো হলো?	
তাহলে কি বাতাসের আয়তন আছে?	
বাতাস ভর্তি ব্যাগটির আটকানোর পর রুলারের কোন দিকটি ঝুঁকে পড়েছে?	
কেন ঝুঁকে পড়েছে?	
চাপ প্রয়োগে কি বাধা অনুভব করেছিলে?	
বাতাস কি কঠিন ও তরল পদার্থের তিনটি বৈশিষ্ট্যই প্রদর্শন করেছে?	
আমরা কি বাতাসকে একটি পদার্থ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি?	

সহজ নিক্তির সাহায্যে বায়ুর ওজন আছে তা শনাক্তকরণ

সারসংক্ষেপ

বাতাস একটি পদার্থ। কঠিন ও তরল পদার্থের ন্যায় বাতাস বা বায়বীয় পদার্থেরও ওজন আছে, আয়তন আছে। তাছাড়া বায়বীয় পদার্থ চাপ প্রয়োগে বাধা প্রদান করে।

২. পানির বিভিন্ন রূপ

পানি

বরফ গলে পানি হচ্ছে

তাপের মাধ্যমে পানি বাষ্প হচ্ছে

আমরা ইতোমধ্যে পদার্থের বিভিন্ন ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনেছি। প্রত্যেক পদার্থকে আমরা তিন ধরনের ভিন্ন রূপে পাই, যেমন–কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় বা বায়বীয় । আমরা কি এমন কোনো পদার্থের কথা ভাবতে পারি যাকে এই তিন অবস্থাতেই দেখেছি? চলো, পানির কথা ভেবে দেখি। আমরা আজ পানির তিনটি অবস্থা নিয়ে কথা বলব।

? পানির কী কী রূপ আছে?

কাজ: বরফে তাপ প্রয়োগ করলে কী ঘটে তা পর্যবেক্ষণ

যা করতে হবে:

নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করি এবং চিত্রের **শূন্যস্থান** পূরণ করি।

বরফ গরম করার ফলে কী ঘটে? এখানে বরফের কি কোনো পরিবর্তন হয়?

আমরা কি কখনো বাসায় চা তৈরি করতে বা পানি ফুটাতে দেখেছি?

পানি গরম করার ফলে কী ঘটে? এখানে পানির কি কোনো পরিবর্তন হয়?

সারসংক্ষেপ

বরফকে তাপ প্রয়োগ করলে তা গলে যায় এবং পানিতে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তী সময়ে পানিকে গরম করলে গরম পানি থেকে বাষ্প তৈরি হয়। এভাবে পানির এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর ঘটে।

৩. পানির তিন অবস্থার বৈশিষ্ট্য

পানির তিন অবস্থার কী কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে?

কাজ: পানির তিন অবস্থার নাম ও তার বৈশিষ্ট্য শনাক্তকরণ

যা করতে হবে:

- নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করি।
  - আমরা কি পানিকে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় এই তিনটি অবস্থায় দেখেছি?
  - কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় পানিকে আমরা যে নামে চিনি সেগুলো কী?
- পাশে বসা সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

পানির অবস্থা	অবস্থার নাম	বৈশিষ্ট্য
কঠিন	বরফ	
তরল		
গ্যাসীয়		

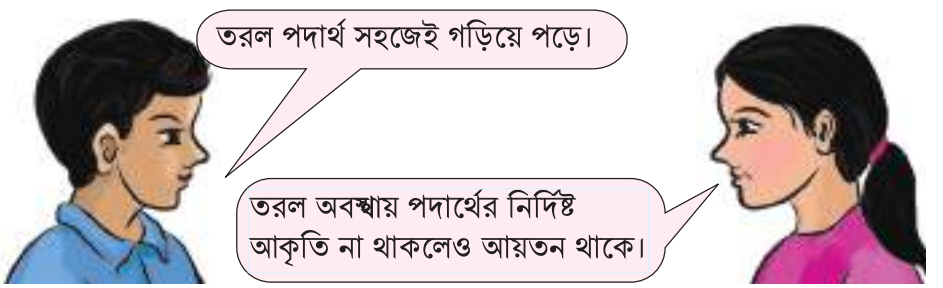

সারসংক্ষেপ

পানিকে আমরা তরল, কঠিন (বরফ) এবং গ্যাসীয় (জলীয়বাষ্প) এই তিন অবস্থায় পাই। প্রতিটি অবস্থার আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন– তরল অবস্থায় পানি গড়িয়ে চলে, এর নির্দিষ্ট আকৃতি না থাকলেও নির্দিষ্ট আয়তন আছে। কঠিন অবস্থায় বরফের নির্দিষ্ট আকৃতি এবং আয়তন আছে। গ্যাসীয় অবস্থায় এর নির্দিষ্ট আকৃতি এবং আয়তন নেই।

তাপীয় অবস্থার পরিবর্তনের কারণে পানি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে। তিন অবস্থাতেই পানি আমাদের জীবনে বিভিন্ন উপকারে আসে।

পানির তিন অবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

অন্যান্য পদার্থের মতো পানির তিনটি অবস্থা আছে। বরফ হলো কঠিন অবস্থায় থাকা পানি। বরফের নিজস্ব আকৃতি রয়েছে। আমরা বরফ স্পর্শ করলে ঠান্ডা অনুভব করি। পানির নিজস্ব আকৃতি থাকে না। পানিকে যে পাত্রে রাখা হয়, সেই আকৃতি গ্রহণ করে। পানি সহজে গড়িয়ে পড়ে, যেমন- গ্লাস থেকে পড়ে গেলে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে। পানির গ্যাসীয় অবস্থা হলো বাষ্প। যখন পানি অনেক গরম হয়, তখন তা বাষ্পে পরিণত হয়। রান্না করার সময় হাঁড়ির ঢাকনা খুললে যে ধোঁয়া ওঠে, সেটিই বাষ্প। এটি বাতাসের সঙ্গে মিশে যায় এবং তারপর এই বাষ্পকে আমরা আর দেখতে পাই না।

বিপরীতভাবে বাষ্পকে ঠান্ডা করলে আমরা তরল পানি পাই। আর পানিকে ঠান্ডা করে বরফ পেতে পারি।

৪. পানির বিভিন্ন অবস্থার গুরুত্ব

তিন অবস্থায় পানি কীভাবে আমাদের উপকারে আসে?

কাজ: পানির বিভিন্ন অবস্থার গুরুত্ব বোঝা

যা করতে হবে:

১। আমাদের ব্যক্তিজীবনে ও পরিবারে পানির বিভিন্ন অবস্থার কী কী ব্যবহার দেখতে পাই, তা নিয়ে দলে আলোচনা করি।

কঠিন তরল বায়বীয়

২। খাতায় নিচের ছকের মতো একটি ছক আঁকি।

৩। দলে আলোচনার আলোকে খাতার ছকটি পূরণ করি।

পানির অবস্থা	ব্যক্তিজীবনে ও পরিবারে পানির বিভিন্ন অবস্থার ব্যবহার

সারসংক্ষেপ

ব্যক্তিজীবনে ও পরিবারে পানির বিভিন্ন অবস্থার ব্যবহার করে থাকি। পানির তরল অবস্থা– গোসল করা, রান্না করা, পান করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। পানির কঠিন অবস্থা– আইসক্রিমসহ বিভিন্ন খাবার তৈরি, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। পানির বায়বীয় অবস্থা– ভাপ দিয়ে পিঠা বানানো, প্রেশার কুকারে রান্না ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার করি।

পানির বিভিন্ন অবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে আরও কিছু জানি ...

পানির কঠিন অবস্থা না থাকলে কি আমরা আইসক্রিম বানাতে পারতাম? পানির গ্যাসীয় অবস্থা না থাকলে কি আমরা মেঘ আর বৃষ্টি পেতাম? পানির তরল অবস্থা না থাকলে আমরা কী পান করতাম?

আমরা জানি, পাহাড়ের চূড়ায় জমে থাকা বরফ গ্রীষ্মকালে গলে নদীতে মিশে যায়। এভাবে আমাদের পানির চাহিদা পূরণ হয়। আবার আমরা প্রতিদিন যে পানি পান করি, রান্না করি, সেচ দিই তার সবই কিন্তু তরল অবস্থায় থাকে। প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য পানির প্রয়োজন অপরিসীম। আকাশে আমরা যে ভাসমান মেঘ দেখতে পাই তা পানির বাষ্পীয় অবস্থা থেকে তৈরি হয়। এগুলো থেকেই পরবর্তী সময়ে বৃষ্টি হয় যা ফসল ফলানোসহ পৃথিবীর জীবনধারা বজায় রাখে।

৫. রাসায়নিক পরিবর্তন

যে প্রক্রিয়ায় এক বা একাধিক পদার্থ মিলে নতুন এক বা একাধিক ভিন্নধর্মী পদার্থ তৈরি হয় তাকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে। দুধ থেকে দই তৈরি করা, ফলমূলে পচন ধরা, পাতার রং পরিবর্তিত হওয়া, মোমবাতি জ্বলা, আতশবাজি পোড়ানো ইত্যাদি রাসায়নিক পরিবর্তনের উদাহরণ।

রাসায়নিক পরিবর্তন কী?

কাজ: বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া রাসায়নিক পরিবর্তন শনাক্তকরণ

যা করতে হবে:

১. চারপাশে যে সব পরিবর্তন হতে দেখি, তার মধ্যে কোনগুলো রাসায়নিক পরিবর্তন তা পাশে বসে থাকা সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে শনাক্ত করি।

২. নিচের ঘটনাগুলোর কোনটি রাসায়নিক পরিবর্তন এবং কেন সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে তা ছকে লিখি।

ঘটনা	রাসায়নিক পরিবর্তন কি ঘটেছে?	কেন এটি রাসায়নিক পরিবর্তন বলে মনে হচ্ছে?
কাগজ পোড়ানো		
কাগজ ছিঁড়ে টুকরো করা		
ফল পাকা		
আপেল কেটে কিছুক্ষণ রেখে দেবার পর রং পরিবর্তন		
বরফ থেকে পানি তৈরি হওয়া		
চিনির দানা গুঁড়া করা		

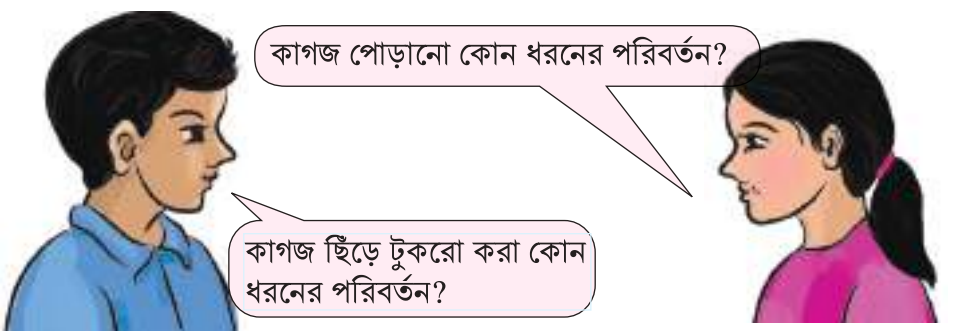

সারসংক্ষেপ

কাগজ পোড়ানো একটি রাসায়নিক পরিবর্তন, কারণ পোড়ানোর ফলে কাগজ ছাই, ধোঁয়া ও গ্যাসে রূপান্তরিত হয়, যা নতুন পদার্থ। অন্যদিকে, কাগজ ছিঁড়ে টুকরো করা রাসায়নিক পরিবর্তন নয়, কারণ এতে শুধু কাগজের আকার বদলায়, কিন্তু কোনো নতুন পদার্থ তৈরি হয় না। ফল পাকাও একটি রায়নিক পরিবর্তন, কারণ ফলের ভেতরে রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এর স্বাদ, রং ও গন্ধ বদলে যায়। আপেল কাটার পর কিছুক্ষণ রেখে দিলে তা লালচে হয়ে যায়, কারণ এতে নতুন পদার্থ তৈরি হয়। তাই এটি একটি রাসায়নিক পরিবর্তন। বরফ থেকে পানি তৈরি হওয়া রাসায়নিক পরিবর্তন নয়, কারণ এটি একটি অবস্থার পরিবর্তন, যেখানে পানি কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় গেলেও রাসায়নিক গঠন একই থাকে। চিনির দানা গুঁড়া করা রাসায়নিক পরিবর্তন নয়, কারণ এতে চিনির কেবল আকার বদলায়, রাসায়নিক গঠন অপরিবর্তিত থাকে।

৬. মরিচা

লোহার পদার্থের উপরে লালচে বা খয়েরি রঙের যে আবরণ থাকে তা হচ্ছে জং বা মরিচা। মরিচা হচ্ছে এক ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন।

মরিচা কী?

কাজ: মরিচা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

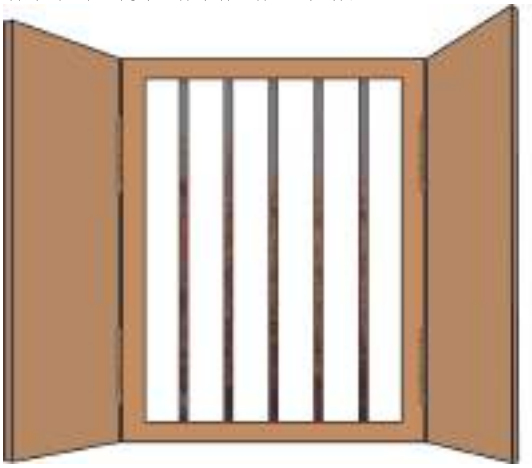

মরিচা ধরা জানালার গ্রিল

দরজার কবজা

যা করতে হবে:

১. কয়েকটি দল গঠন করি।

২. আমাদের শ্রেণিকক্ষের ভিতরে লোহার তৈরি কোনো পদার্থ (যেমন- জানালার গ্রিল, দরজার কবজা) আছে কি না সেগুলো খুঁজে বের করি।

৩. সেই লোহার পদার্থগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিচের ছকটি পূরণ করি–

লোহার পদার্থগুলোর পর্যবেক্ষণ	ফলাফল
এমন কোনো লোহার তৈরি পদার্থ কি পেয়েছ যার উপরে লালচে বা খয়েরি রঙের একটি আবরণ রয়েছে?	
যে আবরণ রয়েছে তার কি কোনো নাম আছে? (প্রয়োজনে সহপাঠী বা শিক্ষকের সহায়তা নিই)	
এই আবরণ কি সরানো সম্ভব?	
এটা কী ধরনের পরিবর্তন?	

সারসংক্ষেপ

লোহার উপাদান দিয়ে পদার্থের উপরে লালচে বা খয়েরি রঙের যে স্তরটি দেখতে পেলাম তা হচ্ছে জং বা মরিচা। লোহার উপর মরিচা তৈরি হওয়া এক ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন।

মরিচা ধরার কারণ

লোহার বস্তুতে কেন মরিচা ধরে?

কাজ: মরিচা ধরার কারণ অনুসন্ধান।

কী কী দরকার: একটি পেরেক, ভেজা টিস্যু বা ভেজা কাপড়ের টুকরা, তেল বা মবিল।

যা করতে হবে:

- দুটি পেরেক সংগ্রহ করি।
- একটি পেরেক ভেজা টিস্যু বা ভেজা কাপড়ের টুকরার মধ্যে জড়িয়ে একটি নিরাপদ স্থানে রেখে দিই। টিস্যু বা কাপড়টিকে নিয়মিত পানি দিয়ে ভেজা অবস্থায় রাখি।
- অন্য পেরেকটিকে তেল, মবিল, গ্রিজ, পেট্রোলিয়াম জেলি জাতীয় যেকোনো একটি পদার্থ দিয়ে ভালো করে প্রলেপ দিই।

- পেরেক দুটি পাশাপাশি রেখে দিই।
- প্রতিদিন একবার করে পরপর তিন দিন পর্যবেক্ষণ করি এবং নিচের ছকটি পূরণ করি।

দিন	ভেজা টিস্যু পেপার বা কাপড় দিয়ে মোড়ানো পেরেকের অবস্থা	তেল/মবিল/গ্রিজ/পেট্রোলিয়াম জেলির প্রলেপ দেওয়া পেরেকের অবস্থা
প্রথম দিনের পর		
দ্বিতীয় দিনের পর		
তৃতীয় দিনের পর		

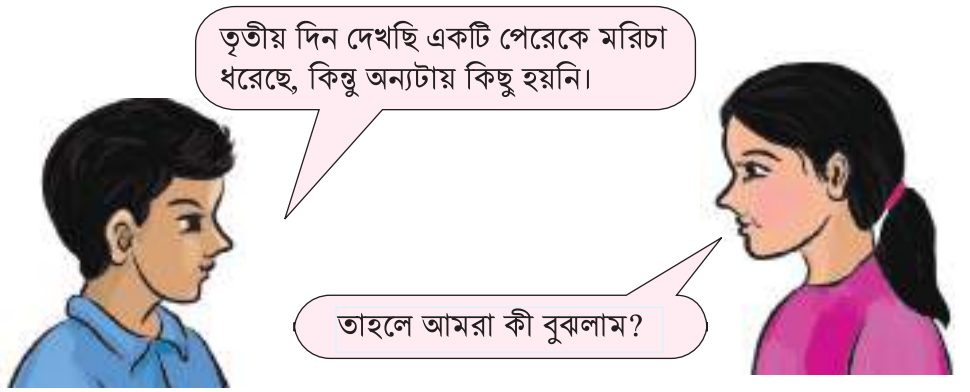

সারসংক্ষেপ

এই কাজের মাধ্যমে মরিচা পড়ার কারণ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। একটি পেরেক ভেজা টিস্যু বা কাপড়ে রেখে প্রতিদিন ভেজা রাখা হয়, যাতে তা সহজে বাতাস ও পানির সংস্পর্শে আসে। অন্য পেরেকটি তেল, মবিল বা গ্রিজ জাতীয় পদার্থ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়, যাতে বাতাস বা পানি না লাগে। তিন দিন পর্যবেক্ষণের পর দেখা যায়, ভেজা পেরেকে মরিচা পড়েছে, কিন্তু তেল/মবিল/গ্রিজ/পেট্রোলিয়াম জেলির প্রলেপ দেওয়া পেরেক মরিচা ধরেনি।

মরিচা ধরার কারণ সম্পর্কে আরো কিছু জানি...

লোহায় মরিচা পড়ার পেছনে পানি বা জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লোহা যখন বাতাসের জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে অক্সিজেনের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে তখন মরিচা তৈরি হয়।

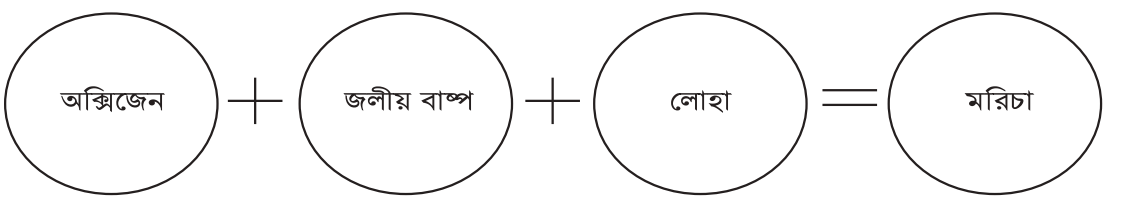

৭. মরিচার ক্ষতিকর প্রভাব ও তা রোধের উপায়

মরিচা তৈরির ফলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বা বস্তু ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে কোনো এক সময় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাই লোহা জাতীয় জিনিসপত্র বা বস্তুকে মরিচার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে।

<table>
<tr>
<td>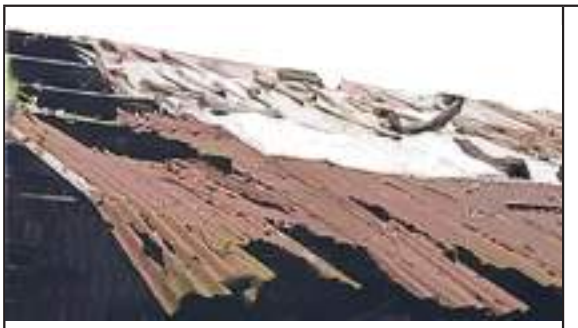
মরিচার প্রভাবে ছিদ্র হয়ে যাওয়া টিনের চাল</td>
<td>
ক্ষয়ে যাওয়া বাইসাইকেলের অংশ</td>
</tr>
<tr>
<td>
নষ্ট হয়ে যাওয়া প্লেট</td>
<td>
মরিচা ধরা চামচ</td>
</tr>
</table>

কীভাবে মরিচা রোধ করা যায়?

কাজ: প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বা বস্তুকে মরিচার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার উপায় শনাক্তকরণ

যা করতে হবে:

১. শ্রেণিতে কয়েকটি দল গঠন করে আলোচনার মাধ্যমে মরিচা রোধের উপায় খুঁজে বের করি।

২. আলোচনা শেষে এককভাবে নিচের ছকটি পূরণ করি।

মরিচা রোধের উপায় কী?

সারসংক্ষেপ

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বা বস্তুকে মরিচার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হলে জলীয় বাষ্প এবং অক্সিজেনের সংস্পর্শ থেকে লোহার তৈরি বস্তুকে দূরে রাখতে হবে।

মরিচা রোধের উপায় সম্পর্কে আরো কিছু জানি...

মরিচা রোধ করার প্রধান উপায় হলো লোহার তৈরি বস্তুকে অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখা। কারণ লোহা, জলীয় বাষ্প এবং অক্সিজেন একত্রিত হলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে মরিচা (লোহার অক্সাইড নামক উপাদান) তৈরি হয়। এটি ধীরে ধীরে লোহার ক্ষয় ঘটায়। এই মরিচা প্রতিরোধ করার জন্য তেল, গ্রিজ বা মবিল লাগানো যেতে পারে। লোহার উপর রঙের স্তর অথবা জিংক বা দস্তার প্রলেপ দেওয়া যায়। এই প্রলেপ অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পকে সরাসরি লোহার সংস্পর্শে আসতে বাধা দেয়। ফলে লোহার মরিচা প্রতিরোধে এসব প্রলেপ সাহায্য করে। এছাড়া লোহার পরিবর্তে মরিচা প্রতিরোধী বিশেষ ধরনের ইস্পাত (স্টেইনলেস স্টিল) ব্যবহার করা যেতে পারে ।

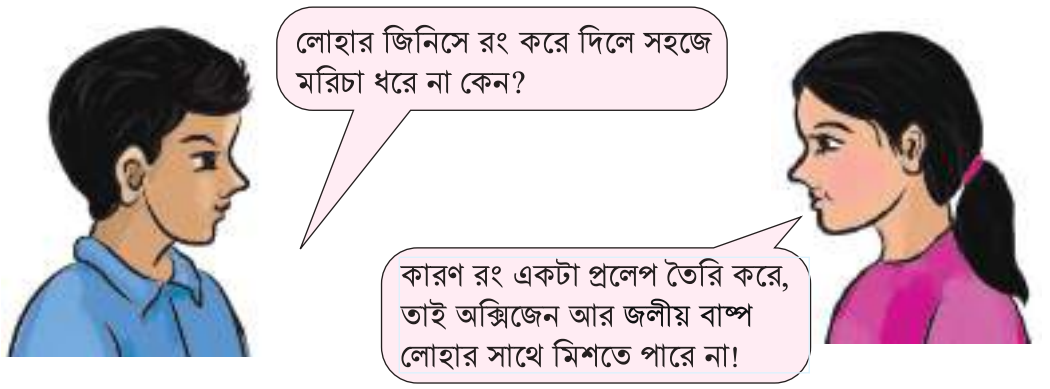

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিই।

১) নিচের কোনটি বায়বীয় পদার্থের বৈশিষ্ট্য নয়?

ক) ওজন আছে　　খ) নির্দিষ্ট আয়তন আছে

গ) চাপ দিলে বাধা দেয়　　ঘ) জায়গা দখল করে

২) নিচের কোনটি পদার্থের ওজন আছে তা প্রমাণ করার একটি উপায়?

ক) নিক্তি তৈরি করে তুলনা করা　　খ) রং দিয়ে চিহ্ন দেয়া

গ) পানিতে ভিজানো　　ঘ) কাগজে আঁকা

৩) কোন পরিবর্তনটি রাসায়নিক পরিবর্তন নয়?

ক) লোহায় মরিচা ধরা　　খ) কাচ ভাঙা

গ) দুধ থেকে দই হওয়া　　ঘ) পাতার রং পরিবর্তন

৪) মরিচা তৈরি হতে কী লাগে না?

ক) পানি　　খ) লোহা

গ) অক্সিজেন　　ঘ) আগুন

২। শূন্যস্থান পূরণ করি

ক) সিরিঞ্জের মুখ বন্ধ করে চাপ দিলে, ভিতরের বাতাস ----------প্রদান করে।

খ) বরফ হলো পানির ----------অবস্থা, পানি হলো---------- অবস্থা,
আর বাষ্প হলো ----------অবস্থা।

গ) বাতাসও একটি পদার্থ, কারণ এর ----------ও ---------- রয়েছে ।

ঘ)

৩। বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল করি।

বাম	ডান
বরফ	নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন নেই
পানি	থাকায় আমরা আইসক্রিম বানাতে পারি
বাতাসের	গলে পানিতে পরিণত হয়
পানির কঠিন রূপ	তাপ দিলে বাষ্প হয়

৪। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক) বাতাস চোখে দেখা যায় না, তবে আমরা কীভাবে বুঝি এটি একটি পদার্থ?

খ) পদার্থের কোন বৈশিষ্ট্যটি গ্লাসে রাখা পানিতে পাথর ফেললে বোঝা যায়?

গ) কীভাবে বুঝবে কোনো একটি পদার্থ কঠিন না তরল?

৫। বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক) বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কঠিন, তরল ও গ্যাস– এই তিনটি অবস্থার পার্থক্য করি।

খ) পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন কী? পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনের তিনটি উদাহরণ দিই।

গ) কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থার পানি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কী কাজে লাগে তা ব্যাখ্যা করি।

অধ্যায় ৫

শক্তি

তৃতীয় শ্রেণিতে আমরা বিভিন্ন শক্তি সম্পর্কে জেনেছি। আলোকশক্তি আমাদেরকে দেখতে সাহায্য করে। শব্দশক্তি আমাদেরকে শুনতে সাহায্য করে। বিদ্যুৎশক্তি আমাদের বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চালাতে সাহায্য করে। তাপশক্তি রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়।

১. শক্তির বিভিন্ন রূপ

শক্তির বিভিন্ন ধরন বা রূপ আছে। চারপাশ থেকে আমরা শক্তির বিভিন্ন রূপ খুঁজে বের করতে পারি।

আমাদের চারপাশে কী কী ধরনের শক্তি রয়েছে?

কাজ: শক্তির বিভিন্ন রূপ চিহ্নিত করা।

যা করতে হবে:

প্রকৃতিতে বিভিন্ন শক্তি

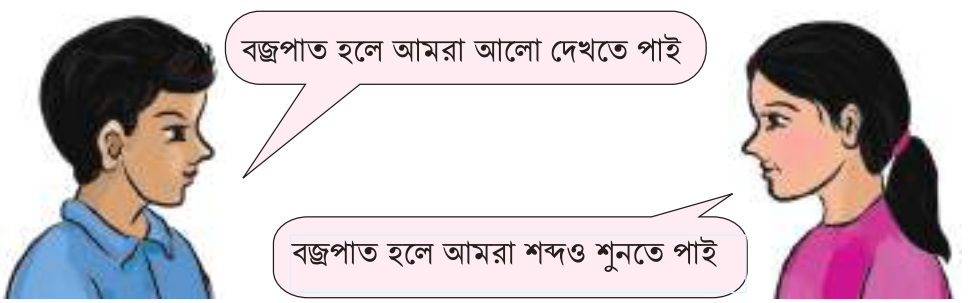

১. উপরের চিত্রটি ভালো করে লক্ষ করি।

২. ছবির বিভিন্ন ঘটনাগুলোতে শক্তির কী কী রূপ আছে তা নিচের ছকে লিখি ।

ঘটনা	সংশ্লিষ্ট শক্তি
বজ্রপাত	

সারসংক্ষেপ

বিদ্যুৎ চমকানোর ঘটনার সাথে আলোর ঝলকানি দেখা যায়। কাজেই আলোকশক্তি এর সাথে জড়িত। বৃষ্টিপাত হলে আশেপাশের পরিবেশ শীতল হয়ে যায়, ফলে এতে তাপশক্তির প্রভাব রয়েছে। বজ্রপাত হলে ঘরের চালে বৃষ্টি বা শিলা পড়লে শব্দশক্তি তৈরি হয়। বাতাসের গতিশক্তি থাকায় গাছপালা নড়ে ও নুইয়ে পড়ে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোর সাথে আরেকটি শক্তি জড়িত এবং তা হলো বিদ্যুৎশক্তি।

কাজ: গাড়ির বিভিন্ন অংশে শক্তির বিভিন্ন রূপ খুঁজে বের করা।

যা করতে হবে:

উপরের গাড়িটি ভালোভাবে দেখি এবং এর সাথে কী কী শক্তি সম্পর্কিত আছে তা ছকে লিখি।

গাড়ির অংশ	কোন শক্তি সম্পর্কিত
ব্যাটারি	রাসায়নিক শক্তি
জ্বালানি তেল	
হেডলাইট	
হর্ন	
চাকা	

সারসংক্ষেপ

গাড়ির ব্যাটারি এবং তেলে রাসায়নিক শক্তি জমা থাকে। হেডলাইটগুলো আলোকশক্তি দিয়ে সামনের রাস্তাকে আলোকিত করে এবং হর্ন শব্দশক্তি তৈরি করে। গাড়ির ব্যাটারি থেকে হেডলাইট এবং গাড়ির হর্ন বৈদ্যুতিক শক্তি পায়। গাড়ির চাকার সাথে গতিশক্তি জড়িত ।

শক্তির বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে আরো কিছু জানি...

তাপশক্তি

একটি বস্তু যত বেশি গরম হয়, তাতে তাপ শক্তি তত বেশি থাকে। যেমন– এক কাপ গরম পানিতে এক কাপ ঠান্ডা পানির চেয়ে বেশি তাপশক্তি রয়েছে। আবার তাপশক্তি এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হতে পারে। যেমন– গরম পানিসহ একটি গ্লাসের ক্ষেত্রে পানি থেকে গ্লাসে তাপ স্থানান্তরিত হয়।

তাপশক্তি ও এর স্থানান্তর

আলোকশক্তি

এটি আমাদের দেখতে সহায়তা করে এবং এই শক্তি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অনেক দূর পর্যন্ত স্থানান্তরিত হতে পারে। যেমন–সূর্য থেকে আলো অনেক দূরের পথ অতিক্রম করে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়।

সূর্য

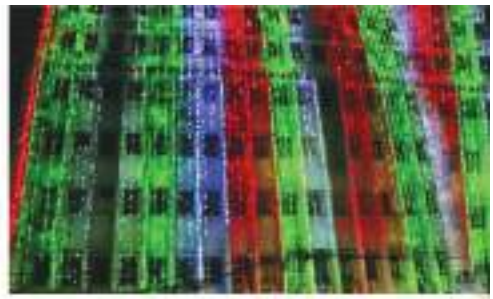

আলোকসজ্জা

টর্চ লাইট

বিদ্যুৎশক্তি

আমরা বিদ্যুৎশক্তি দেখতে না পেলেও এটি যে আছে, তা বুঝতে পারি। লোড শেডিং হলে বাসায় কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চালানো যায় না। আবার ব্যাটারির চার্জ শেষ হলে বাসার দেয়াল ঘড়ি এবং বিদ্যুৎ চালিত খেলনাগুলোও চলে না।

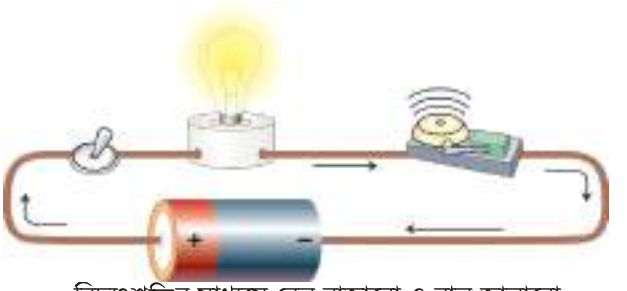

বিদ্যুৎশক্তির মাধ্যমে বেল বাজানো ও বাল্ব জ্বালানো

শব্দশক্তি

শব্দ হলো এক ধরনের শক্তি যা আমরা শুনতে পাই। বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দ তৈরি হয়। যেমন– স্কুলের ঘণ্টা বাজালে এটি কেঁপে ওঠে এবং আমরা শব্দ শুনতে পাই।

স্কুলের ঘণ্টা

রাসায়নিক শক্তি

আমরা খাবার খেলে শক্তি পাই। এই শক্তি খাদ্যে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা থাকে। একইভাবে জ্বালানি তেল, কাঠ, গ্যাস, কয়লা এবং ব্যাটারিতেও রাসায়নিক শক্তি জমা থাকে।

ব্যাটারি

খাবার

জ্বালানি তেল

গতিশক্তি

গতিশীল বস্তু গতির ফলে শক্তি পায়। দৌড়ালে, লাফ দিলে, সাইকেল চালালে বা উড়োজাহাজ উড়ার সময় গতিশক্তি তৈরি হয়। কোনো বস্তুর গতি যত দ্রুত, তার গতিশক্তিও তত বেশি।

উড়োজাহাজ উড়ছে

দৌড়ানো

বল ছুড়ে মারা হয়েছে

স্থিতিশক্তি

স্থিতিশক্তি হলো এমন একটি শক্তি, যা কোনো বস্তুর অবস্থানের কারণে জমা থাকে। যেমন– যখন একটি গাড়ি পাহাড়ের চূড়ায় থাকে, তখন এটি ভূমির চেয়ে উপরে থাকার কারণে এতে স্থিতিশক্তি জমা থাকে। ছবির মতো অবস্থায় গাড়ি বন্ধ করলেও তা নিচের দিকে চলতে থাকে। বন্ধ অবস্থায় চলমান গাড়ির শক্তির উৎস হলো এর ভেতর জমা থাকা স্থিতিশক্তি।

কাগজের টুকরাসহ একটি রাবার ব্যান্ডকে টেনে ধরলে তাতে স্থিতিশক্তি জমা হয়। রাবার ব্যান্ডকে ছেড়ে দেওয়া হলে সেই স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে রাবার ব্যান্ডের সাথে সাথে কাগজের টুকরাটি গতিবেগ প্রাপ্ত হয়। কাগজের টুকরার এই বেগ পাওয়ার কারণ হচ্ছে রাবারে জমা থাকা স্থিতিশক্তি।

রাবারের স্থিতিশক্তি কাগজের টুকরার গতি লাভ

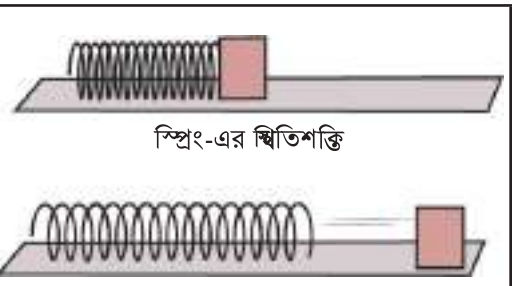

স্প্রিং-এর স্থিতিশক্তি

কাঠের টুকরার গতিলাভ

অনুরূপভাবে, সংকুচিত স্প্রিং-এর সাথে একটি কাঠের টুকরা থাকলে সেখানে স্থিতিশক্তি জমা থাকে। পরবর্তী স্প্রিংকে ছেড়ে দিলে কাঠের টুকরাটি গতিপ্রাপ্ত হয়।

কাজ: শক্তির বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে জানি।

যা করতে হবে:

১. পূর্বের পাঠে শক্তির সাতটি রূপ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। একটি করে শক্তির রূপের তথ্য মনোযোগ সহকারে পড়ি ও দলে আলোচনা করি। দলের একজন সদস্য শ্রেণিতে তথ্যটি উপস্থাপন করি।

২. প্রত্যেক দলের উপস্থাপনা শেষে শক্তির সাতটি রূপের বৈশিষ্ট্য দলে আলোচনা করে নিচের ছকে লিখি।

শক্তির রূপ	বৈশিষ্ট্য

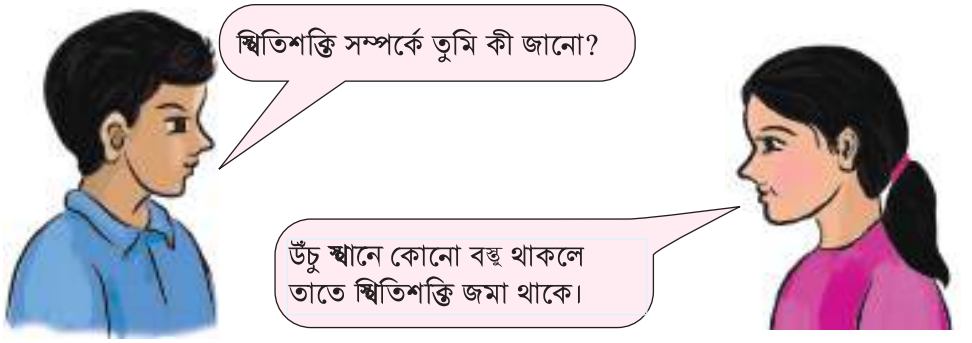

২. শক্তির উৎস

দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন পরিবর্তন দেখতে পাই যার পেছনে কোনো না কোনো শক্তির উৎস কাজ করে। যেমন– গাড়ি চলতে রাসায়নিক শক্তি প্রয়োজন হয়। এই রাসায়নিক শক্তি তেল বা গ্যাস থেকে পাওয়া যায়। মোবাইল চার্জের ক্ষেত্রে কোন শক্তি উৎস হিসেবে কাজ করে আমরা কি তা জানি? এসো আমরা একটি মজার কাজ করি।

? শক্তির বিভিন্ন উৎস কী কী?

কাজ: শক্তির উৎস খুঁজে বের করা।

যা করতে হবে:

১। নিচের ছবিগুলো ভালোভাবে লক্ষ করি।

ঘূর্ণি ঘুরছে পাথর গড়িয়ে পড়ছে গ্যাসের চুলায় রান্না হচ্ছে

মোবাইল চার্জ হচ্ছে

টর্চ থেকে আলো বের হচ্ছে

২। উপরের ঘটনাগুলোর পেছনে শক্তির উৎসের নামসমূহ নিচের ছকে লিখি।

ঘটনা	শক্তির কোন রূপ উৎস হিসেবে কাজ করছে?
ঘূর্ণি ঘোরা	বাতাসের গতিশক্তি
পাহাড়ের উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়া	
গ্যাসের চুলায় রান্না করা	
মোবাইল চার্জ করা	
টর্চ থেকে আলো ছড়ানো	

সারসংক্ষেপ

বাতাসের গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঘূর্ণি ঘোরে। পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে পড়া পাথরের শক্তির উৎস হলো এতে জমা থাকা স্থিতিশক্তি। গ্যাসের চুলার গ্যাসের শক্তির উৎস হলো রাসায়নিক শক্তি। মোবাইল চার্জিংয়ের বেলায় বিদ্যুৎশক্তি উৎস হিসেবে কাজ করে। টর্চ থেকে আলো পাওয়ার জন্য ব্যাটারির দরকার হয়। তাই টর্চ থেকে আলো ছড়ানোর ক্ষেত্রে রাসায়নিক শক্তি উৎস হিসেবে কাজ করে।

? বিদ্যুৎশক্তির কী কী উৎস রয়েছে?

কাজ: বিদ্যুৎশক্তির উৎস চিহ্নিত করা।

বিভিন্ন উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়:

(১) সৌরকোষের সাহায্যে
(২) জেনারেটরের সাহায্যে
(৩) খরস্রোতা পানির প্রবাহে বাঁধের সাহায্যে
(৪) বায়ুকলের সাহায্যে

যা করতে হবে:

বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতিতে শক্তির উৎস কী তা নিয়ে দলে আলোচনা করি এবং নিচের ছকটি পূরণ করি।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদ্ধতি	শক্তির উৎস
বাঁধ দিয়ে	
বায়ুকলের সাহায্যে	
জেনারেটরের সাহায্যে	
সৌরকোষের সাহায্যে	

সারসংক্ষেপ

বাঁধ দিয়ে আটকে রাখা পানিতে স্থিতিশক্তি জমা থাকে। বাঁধের জলাধারে সঞ্চিত পানি ছেড়ে দেওয়া হলে তা বয়ে যেতে থাকে। বয়ে যাওয়া পানি একটি জেনারেটরের সাথে সংযুক্ত টারবাইনটিকে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করে। এক্ষেত্রে শক্তির উৎস হলো পানিতে থাকা স্থিতিশক্তি। বায়ুকলে বাতাস ব্যবহার করে ব্লেডগুলোকে ঘুরিয়েও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এক্ষেত্রে শক্তির উৎস হবে বাতাসের গতিশক্তি। জ্বালানি তেল ব্যবহার করে জেনারেটর বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা শক্তির উৎস হলো রাসায়নিক শক্তি। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আলোকশক্তি দরকার হয়। তাই সৌরকোষের সাহায্যে উৎপন্ন বিদ্যুতের উৎস হলো আলোকশক্তি।

৩. শক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার

শক্তি সাশ্রয় করা, শক্তির অপচয় কমানো, নবায়নযোগ্য শক্তিগুলো বেশি ব্যবহার করাই হলো- শক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার। এক্ষেত্রে শক্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যা আমাদের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের জন্য ভালো।

? কীভাবে শক্তির যথাযথ ব্যবহার করা যায়?

কাজ: শক্তির সঠিক ব্যবহার খুঁজে বের করা।

যা করতে হবে:

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে শক্তির সঠিক ব্যবহার করা যায় তা নিচের ছকে লিখি।

শক্তির নাম	শক্তির যথাযথ ব্যবহার
আলোকশক্তি	
বিদ্যুৎশক্তি	
শব্দশক্তি	
তাপশক্তি	

সারসংক্ষেপ

শক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার করতে সূর্য উঠার সাথে সাথে ঘুম থেকে উঠতে হবে যাতে সূর্যের আলোকে কাজে লাগানো যায়। শক্তি-খরচ কম হয় এমন বাল্ব ব্যবহার করলে বৈদ্যুতিক শক্তির যথাযথ ব্যবহার করা। শব্দশক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহারের জন্য হাসপাতালের কাছাকাছি এলাকায় বিনা প্রয়োজনে হর্ন বাজানো এড়িয়ে চলা। তাপশক্তির সঠিক ব্যবহার করতে খোলা মগের পরিবর্তে একটি ভালো মানের ফ্লাক্সে গরম পানি রাখা উচিত।

কাজ: শক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার শনাক্তকরণ।

যা করতে হবে:

নিচের ছবিগুলো দেখি এবং কীভাবে শক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার করা যায় তা নিচের ছকে লিখি।

ছাত্ররা ক্লাসরুম ছেড়ে যাচ্ছে

ল্যাপটপ ব্যবহার শেষ হয়েছে

অপ্রয়োজনে গ্যাসের চুলা জ্বলছে

পানির ট্যাংক থেকে পানি উপচে পড়ছে

ঘটনা	শক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার
তুমি ক্লাসরুম ছেড়ে যাওয়া সর্বশেষ শিক্ষার্থী	
কম্পিউটার বা ল্যাপটপ ব্যবহার শেষ হয়েছে	
অপ্রয়োজনে গ্যাসের চুলা জ্বলছে	
বাসার ছাদে পানির ট্যাংক থেকে পানি উপচে পড়ছে	

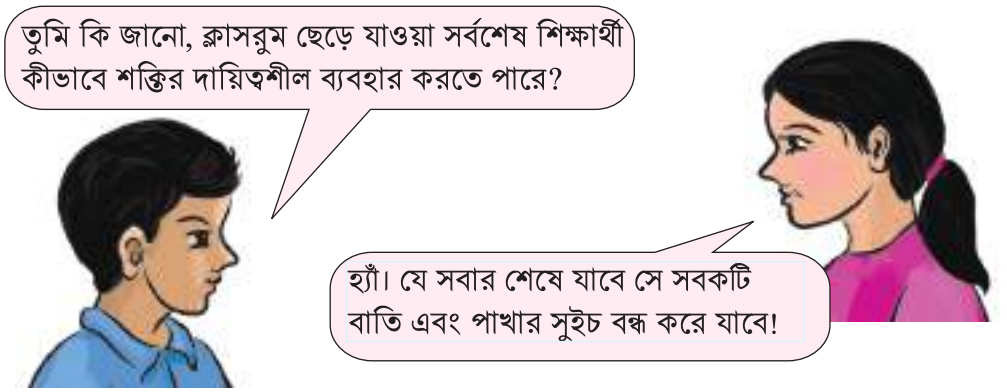

সারসংক্ষেপ

প্রতিটি পরিস্থিতিতে শক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার করা উচিত। যেমন আমাদের মধ্যে কেউ ক্লাসরুম ছেড়ে যাওয়া সর্বশেষ শিক্ষার্থী হলে ক্লাস থেকে বের হওয়ার আগে সবগুলো বাতি এবং পাখা বন্ধ করে যাব। এতে শক্তির অপচয় হবে না। কম্পিউটার বা ল্যাপটপ ব্যবহার শেষ হলে বিদ্যুৎ খরচ বাঁচাতে আমরা কম্পিউটার বন্ধ করে রাখব। রান্না শেষ হবার সাথে সাথে গ্যাসের চুলা বন্ধ করব, অপ্রয়োজনে চুলা জ্বালিয়ে রাখব না। পানি পাম্প করার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। তাই বাসার ছাদে পানির ট্যাংকে পানি উপচে পড়তে শুরু করলে সাথে সাথে পানির পাম্প বন্ধ করে দিব।

শক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার সম্পর্কে আরো কিছু জানি...

অভ্যাস ও আচরণের পরিবর্তন করে শক্তির অপচয় কমিয়ে আনা যায়। যেমন– ভোরে ঘুম থেকে উঠে লাইট জ্বালানোর পরিবর্তে জানালার পর্দা সরিয়ে সূর্যের আলোয় ঘরকে যেমন আলোকিত করা যায়। জানালা খোলা থাকলে ঘরে বাতাস সহজেই চলাচল করতে পারে। বিদ্যুৎ খরচ কমাতে কম শক্তি লাগে এমন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা উচিত। দরকার না থাকলে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ করা, চার্জ দেয়া শেষ হলে মোবাইল চার্জারের বৈদ্যুতিক সংযোগ খুলে রাখা, প্রয়োজন শেষে ফ্রিজের দরজা বন্ধ করা উচিত। অনেক দিনের জন্য বাসা থেকে বের হওয়ার আগে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং পানির কল ভালোভাবে বন্ধ করে যাওয়া উচিত। তাপশক্তির অপচয় কমাতে তাড়াতাড়ি রান্না হয় এমন পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। রান্নার সময় পাত্র ঢেকে রাখলে দ্রুত রান্না হয়। শীতকালে পানি গরম রাখার জন্য ফ্লাস্ক ব্যবহার করার মাধ্যমে তাপশক্তি সাশ্রয় করা যেতে পারে।

সকালে জানালার পর্দা সরিয়ে ঘরকে আলোকিত করা

প্রয়োজন শেষে ফ্রিজের দরজা বন্ধ করা

সঠিকভাবে শক্তি ব্যবহার করার জন্য যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মানসিকতা তৈরি করা দরকার। যেমন– জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমানো কারণ এসব জ্বালানি পরিবেশ দূষণ ঘটায়। রাসায়নিক শক্তির সঠিক ব্যবহারের জন্য জৈব জ্বালানির এবং রিচার্জেবল ব্যাটারির ব্যবহার বাড়াতে চেষ্টা করা। সৌর এবং জলবিদ্যুতের মতো নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানো। ব্যক্তিগত গাড়ির বদলে গণপরিবহণ ব্যবহার করা, সাইকেল ব্যবহার করা, সম্ভব হলে পায়ে হাঁটার মাধ্যমে আমরা শক্তির সাশ্রয় করতে পারি।

শক্তির যথাযথ ব্যবহারে পরিবেশবান্ধব আচরণ

সহপাঠী এবং আশপাশের মানুষকে শক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা প্রয়োজন। সহনীয় মাত্রার চেয়ে জোরালো শব্দ শব্দদূষণ তৈরি করে যা কানে শোনার ক্ষমতা কমায় এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। গাড়ি চালানোর সময়, বিশেষ করে হাসপাতাল, স্কুল এবং আবাসিক এলাকায় অপ্রয়োজনে হর্ন বাজানো উচিত নয়। উচ্চস্বরে গান বাজানোও উচিত নয়।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক(✓)) চিহ্ন দিই।

১. স্কুলের ঘণ্টা বাজলে কোন শক্তি উৎপন্ন হয়?
ক) আলোকশক্তি খ) রাসায়নিক শক্তি গ) শব্দশক্তি ঘ) স্থিতিশক্তি

২. নিচের কোনটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস নয়?
ক) তেল খ) সূর্যের আলো গ) চাঁদের আলো ঘ) বাতাস

৩. রাসায়নিক শক্তি কোথায় পাওয়া যায়?
ক) হর্ন খ) টর্চ লাইট গ) ব্যাটারি ঘ) সাইকেল

৪. নিচের কোনটি শক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার নয়?
ক) জানালার পর্দা সরিয়ে আলো ব্যবহার খ) অপ্রয়োজনে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখা
গ) রিচার্জেবল ব্যাটারি ব্যবহার ঘ) ফ্রিজের দরজা দ্রুত বন্ধ করা

২। শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. _____ শক্তি আমাদের শুনতে সাহায্য করে।

২. উঁচু স্থান থেকে লাফ দিলে _____ শক্তি তৈরি হয়।

৩. গরম পানির ফ্লাস্ক ব্যবহারে _____ শক্তির অপচয় কমে।

৩। বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল করি।

বাম	ডান
এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে সহজে স্থানান্তর হওয়া শক্তি	স্থিতিশক্তি
ফ্রিজের দরজা বেশিক্ষণ খোলা না রাখা	রাসায়নিক শক্তি
তেলে জমে থাকা শক্তি	তাপশক্তি
বাঁধ দিয়ে আটকে রাখা পানিতে জমা শক্তি	ভালো অভ্যাস

৪। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক) রাসায়নিক শক্তি কী?

খ) বিদ্যুৎশক্তি বিভিন্ন উৎসের নামগুলো কী কী?

৫। বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক) গতিশক্তি এবং স্থিতিশক্তি বলতে কী বুঝি? তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করি।

খ) দৈনন্দিন জীবনে শক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার করতে কী কী করা উচিত?

অধ্যায় ৬

গতি ও বল

তৃতীয় শ্রেণিতে আমরা বস্তুর উপর বলের প্রভাব সম্পর্কে জেনেছি। বল বস্তুর আকার, আকৃতি ও আয়তনের পরিবর্তন করতে পারে। বস্তুর গতির পরিবর্তনে বলের কোনো প্রভাব আছে কি?

১. গতি ও বল

বিজ্ঞানে গতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গতির ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, সময়ের সাথে সাথে কোনো বস্তুর অবস্থান পরিবর্তিত হওয়া। অন্যদিকে যার প্রভাবে কোনো পদার্থের অবস্থা, আকৃতি ও গতির পরিবর্তন ঘটে তাকেই বল বলা হয়।

? গতির পরিবর্তনে বলের কী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়?

খেলার মাঠে একজন খেলোয়াড়কে একটি স্থির ফুটবলের উপর পা দিয়ে কিক মেরে দূরে পাঠিয়ে দিতে দেখি। যে মুহূর্তে স্থির ফুটবলটির উপর আঘাত করা হয় কেবল তখনই ফুটবলটিতে বল প্রয়োগ করা হয়। এই বলের কারণেই স্থির ফুটবলটি গতি লাভ করে।

কাজ: গতির পরিবর্তনে বলের ভূমিকা

যা করতে হবে:

১. একজন খেলোয়াড় খোলা মাঠে সমতল জায়গায় একটি ফুটবল রেখে গোলবার বরাবর কিক করবে।
২. এবার চলন্ত ফুটবলটি গোলরক্ষক হাত দিয়ে থামিয়ে দিবে।
৩. বল প্রয়োগের ফলে আমরা ফুটবলের গতি পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করলাম। দৈনন্দিন জীবনে বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর গতি পরিবর্তনের আরো উদাহরণ দলে আলোচনা করে ছকে লিখি।

দৈনন্দিন জীবনে গতির পরিবর্তনে বলের প্রভাবের উদাহরণ
১ . একজন ফুটবল খেলোয়াড় যখন ফুটবলে লাথি মারে তখন বলের প্রভাবে ফুটবলটির গতির পরিবর্তন হয়।
২ .
৩.
৪.

সারসংক্ষেপ

দৈনন্দিন জীবনে আমরা গতির বিভিন্ন পরিবর্তনের সাথে বলের সম্পর্ক খুঁজে পাই। বল প্রয়োগে বস্তুর গতির পরিবর্তন ঘটে। যেমন, একজন ফুটবল খেলোয়াড় যখন ফুটবলে লাথি মারেন তখন বলের প্রভাবে ফুটবলটির গতির পরিবর্তন হয়। একইভাবে কোনো ব্যক্তি দৌড়ালে বা সাঁতার কাটলে তাকে বল প্রয়োগ করতে হয়। এই বল প্রয়োগের ফলে তার গতির পরিবর্তন হয়।

২. বল প্রয়োগের ধরন ও প্রভাব

বল প্রয়োগে বস্তুর কী পরিবর্তন ঘটে?

কাজ: বল প্রয়োগে বস্তুর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ

যা করতে হবে: নিচের ছবিগুলো দেখে বল প্রয়োগের ফলে কী ঘটে তা ছকে লিখি

ঘটনা-১	ঘটনা-২	ঘটনা-৩

ঘটনা	বল প্রয়োগের ধরন	কী ঘটে?
ঘটনা-১		
ঘটনা-২		
ঘটনা-৩		

সারসংক্ষেপ

আমাদের প্রয়োজনেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে গতির পরিবর্তন বা গতির দিক পরিবর্তন করতে হয়। কোনো বস্তুকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরাতে বা অবস্থানের পরিবর্তন করতে আমরা বল প্রয়োগ করি। আবার বস্তুর আকৃতি পরিবর্তনেও আমরা বল প্রয়োগ করে থাকি।

বল প্রয়োগের ধরন ও প্রভাব সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

বলের ধরন বিভিন্ন রকম হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের বল প্রয়োগ করলে বস্তুর গতি ও অবস্থার পরিবর্তন দেখা যায়। বল প্রয়োগের মাধ্যমে স্থির বস্তুকে গতিশীল করা যায় অথবা গতিশীল বস্তুকে স্থির করা যায়। এছাড়াও বল প্রয়োগের মাধ্যমে বস্তুর আকার, আয়তন, আকৃতি ইত্যাদি পরিবর্তন করা যায়।
সাধারণভাবে টানা বলের সাহায্যে কোনো কিছুকে নিজের দিকে আনা হয়। চাপের সাহায্যে বল প্রয়োগে বস্তুর আয়তন বা আকৃতি পরিবর্তন হয়। আবার 'ঠেলা'র মাধ্যমে বল প্রয়োগে বস্তুকে পিছন দিক থেকে ঠেলে দেওয়া হয় এবং বস্তুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরানো যায়।

৩. দৈনন্দিন জীবনে গতি পরিবর্তনে বলের ভূমিকা

গতির পরিবর্তনে বলের কী ধরনের প্রভাব ঘটে?

কাজ: গতির পরিবর্তনে বলের প্রভাব পর্যবেক্ষণ

যা করতে হবে: নিচের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে গতির পরিবর্তনে বল কীভাবে কাজ করে তা ছকে লিখি–

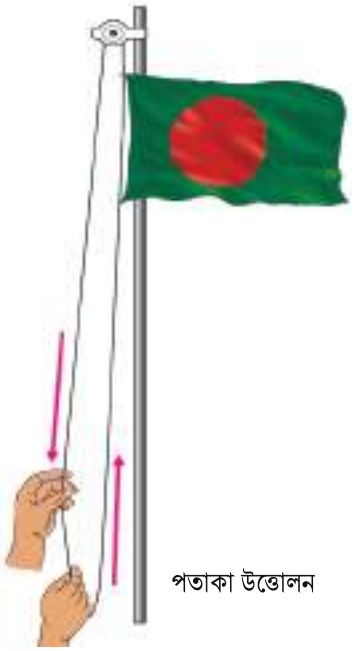

পতাকা উত্তোলন

সাইকেল চালানো

সাঁতার কাটা

বিষয়	গতির পরিবর্তনে বলের প্রভাব
পতাকা উত্তোলন	
সাইকেল চালানো	
সাঁতার কাটা	

সারসংক্ষেপ

দৈনন্দিন জীবনে বল প্রয়োগ করে আমরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করে থাকি। সাইকেল চালানো, পতাকা উত্তোলন, সাঁতার কাটার জন্য বলের প্রয়োজন হয়।

গতি পরিবর্তনে বলের ভূমিকা সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা ধরনের কাজ করে থাকি। এই কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বল প্রয়োগ করা হয়। যেমন– ধাক্কা, টান, চাপ ইত্যাদি। কোনো বস্তুকে আমাদের নিকটে আনতে অথবা দূরে সরাতে বল প্রয়োগ করতে হয়।

সাইকেল চালানোর জন্য আরোহী সিটে বসে প্যাডেলের উপর পা রাখেন। প্যাডেলগুলো একটি চেইন দ্বারা পিছনের চাকার সাথে সংযুক্ত থাকে। আরোহী যখন প্যাডেলগুলোতে বল প্রয়োগ করে তখন পিছনের চাকাটি ঘুরতে থাকে এবং সাইকেলটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এভাবেই সাইকেল গতিশীল হয়। যখন থামানোর প্রয়োজন হয় তখন সাইকেলটির প্যাডেল ঘোরানো বন্ধ করে দেওয়া হয়। এছাড়াও হাতে ব্রেক চেপে গতি কমিয়ে সাইকেল থামানো হয়। আরোহী হ্যান্ডেলের উপর বল প্রয়োগ করে সাইকেলের দিক পরিবর্তন করে ডানে বা বামে যেতে পারেন।

পতাকা উত্তোলনের জন্য একটি রশি ও পতাকা দন্ড প্রয়োজন হয়। পতাকাটি রশির এক মাথায় বাঁধা থাকে। দন্ডের শীর্ষে একটি রিং লাগানো থাকে যার ভিতর দিয়ে পতাকার রশিটি অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। যখন পতাকা উত্তোলন করা হয় তখন রশিকে নিচের দিকে টানা হয় এবং এই টানের ফলে পতাকা উপরের দিকে উঠে যায়।

সাঁতার কাটার সময় যদি কেউ পানিতে শুধু ভেসে থাকে, সে আর জায়গা থেকে নড়বে না। হাত-পা নাড়ালেই সে সামনে বা পিছনে যেতে পারবে। আমরা বুঝলাম সাঁতারের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে যেতে বল প্রয়োজন। এই বল আমরা কীভাবে প্রয়োগ করি? প্রকৃতপক্ষে সাঁতারের ক্ষেত্রে আমরা পানি পেছনের দিকে ঠেলি। তখন পানি আমাদের শরীরকে সামনে ঠেলে দেয় এবং আমরা এগিয়ে যাই। আমরা যত বেশি জোরে হাত-পা নাড়াব, তত বেশি দ্রুত সামনে যেতে পারব।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিই।

ক. নিচের কোনটির সাথে সাথে কোনো বস্তুর অবস্থান পরিবর্তিত হয়?

১) বল ২) গতি

৩) সময় ৪) আয়তন

খ. কী প্রয়োগ করলে স্থির বস্তুকে গতিশীল করা যায়?

১) বস্তু ২) বল

৩) গতি ৪) কোনোটি নয়

গ. পতাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে কোথায় বল প্রয়োগ করা হয়?

১) পতাকাদণ্ডে ২) রশিতে

৩) রিং-এ ৪) মাটিতে

২। শূন্যস্থান পূরণ করি

ক. চাপের সাহায্যে বল প্রয়োগে বস্তুর ----------পরিবর্তন হয়।

খ. ---------- প্রয়োগের ফলে গতির পরিবর্তন হয়।

গ. বল প্রয়োগের মাধ্যমে গাড়ির ---------- নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক. বল ও গতি কাকে বলে?

খ. বল ও গতির মধ্যে পার্থক্য কী?

গ. কোনো বস্তুকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরাতে কী প্রয়োগ করতে হয়?

৪। বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গতি পরিবর্তনে বলের প্রভাব বর্ণনা করি।

খ. বল প্রয়োগের ধরন ও প্রভাব বর্ণনা করি।

অধ্যায় ৭

প্রাকৃতিক সম্পদ

১. প্রাকৃতিক সম্পদের ধারণা

আমাদের বাড়ি বা বিদ্যালয়ের চারপাশে আমরা প্রকৃতিসৃষ্ট অনেক বস্তু দেখি। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এসব বস্তু অপরিহার্য। দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্নভাবে এদের ব্যবহার করে থাকি। মানুষের জন্য মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় এই বস্তুগুলো হলো সম্পদ। প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন যা কিছু মানুষের কাজে লাগে তাই প্রাকৃতিক সম্পদ।

আমরা কোন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করি?

নিচের চিত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ দেখা যাচ্ছে।

কাজ: বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ খুঁজে বের করা।

যা করতে হবে:

১. উপরের চিত্রটি ভালোভাবে লক্ষ করি।

২. নিচের ছকের মতো একটি ছক আঁকি।

৩. ছকে ছবির প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর নাম লিখি এবং এগুলো মানুষের কী কাজে লাগে তা লিখি।

৪. কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

প্রাকৃতিক সম্পদের নাম	মানুষের কী কাজে লাগে

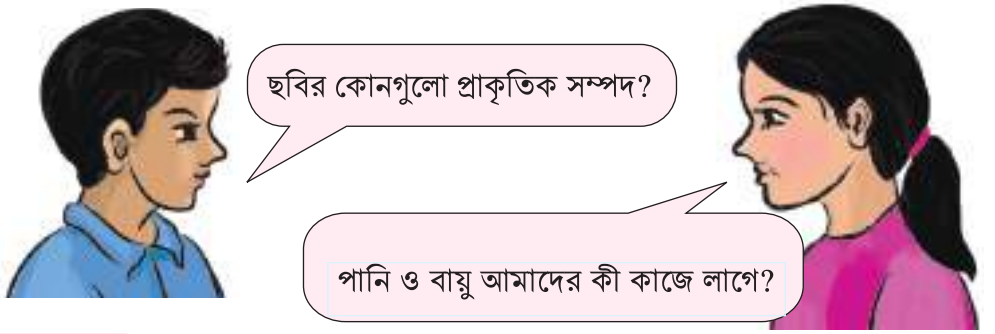

সারসংক্ষেপ

আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুই আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে পাই। দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করি। প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষ তৈরি করতে পারে না।

প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

পানি সম্পদ

পানি সম্পদ

পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রত্যেক জীবের বেঁচে থাকার জন্য পানি প্রয়োজন। আমরা বৃষ্টিপাত, পুকুর, নদী, সাগর ইত্যাদি থেকে পানি পেয়ে থাকি। এছাড়া কুয়া ও নলকূপ থেকেও আমরা পানি পাই। মানুষ বিভিন্ন কাজে পানি ব্যবহার করে। যেমন– পান করা, ধোয়ামোছা, রান্না করা, ফসল ফলানো

ইত্যাদি। আমরা নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাগর, নদী, পুকুর, ও বিল ইত্যাদি থেকে মাছ ধরি; ফসল ফলানোর জন্য পানি সেচ দেই; আবার পানির স্রোতকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করি।

বনজ সম্পদ

বনজ সম্পদ

বন নানা ধরনের গাছপালা, জীবজন্তু ও পাখির আবাসস্থল। মানুষের প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই বন থেকে সংগ্রহ করা হয়। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কাঠের প্রধান উৎস হলো বনের গাছপালা। বনের গাছপালা আমাদের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, বইখাতা তৈরি করার জন্য কাঠের জোগান দেয়; রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠের জোগান দেয়। গাছপালা আমাদের শ্বাস নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন তৈরি ও সরবরাহ করে। বনের গাছপালা বায়ুকে নির্মল করে মানুষের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে সাহায্য করে। তাছাড়া বনের জীবজন্তু , গাছপালা ও পশুপাখি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।

ভূমি সম্পদ

খেলার মাঠ

রাস্তা

ফসলের মাঠ

আমাদের পায়ের নিচে শক্ত মাটিই হলো ভূমি। ভূমি অনেক সম্পদে পূর্ণ যা আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি। মানুষ ভূমির উপর ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করে। ফল, ফসল, শাকসবজি জন্মানো এবং গবাদি পশু চারণের জন্য ভূমির ব্যবহার করা হয়। খেলার মাঠে দৌড়ানো ও খেলাধুলা করা, রাস্তা দিয়ে যাতায়াত ও যানবাহন চালানো–এ সবকিছুই আমরা ভূমির উপর করি। ভূমির গভীর স্তর থেকে সোনা রূপাসহ নানা ধরনের খনিজ পদার্থ, জীবাশ্ম জ্বালানি তোলা হয়। দূষণমুক্ত ও জীবের বাসযোগ্য রাখার জন্য ভূমিকে সংরক্ষণ করতে হবে। আমরা গাছ লাগানোর মাধ্যমে ভূমির যত্ন নিতে পারি।

খনিজ সম্পদ

খনিজ সম্পদ

মাটির গভীরে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ যেমন– খনিজ তেল, কয়লা, ধাতু, প্রাকৃতিক গ্যাস, চুনাপাথর, মার্বেল ইত্যাদি পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের খনিজ ধাতু রয়েছে, যেমন– সোনা, রুপা, তামা এবং লোহা। চুনাপাথর এবং মার্বেল হলো এক ধরনের শিলা। চক, ধাতব মুদ্রা এবং নির্মাণ সামগ্রী তৈরিতে নানা ধরনের খনিজ এবং শিলা ব্যবহার করা হয়। তেল, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে তাপ পাওয়া যায়। এই তাপ কলকারখানা ও যানবাহন চালানো, রান্নার কাজে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়।

অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে আরও রয়েছে সূর্যের আলো ও বায়ু। এরা নিজেরা শক্তি। আবার অন্যান্য শক্তি উৎপাদনেও এদের ব্যবহার করা হয়। সূর্য থেকে আমরা আলো ও তাপ পাই। সূর্যের আলো, বায়ুপ্রবাহ ও পানিপ্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। যেমন– সূর্যের আলো, বায়ু, পানি, মাটি, উদ্ভিদ এবং প্রাণী। এছাড়াও বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, কঠিন শিলা, সিলিকা বালু, সাদামাটি, চুনাপাথর ও নানা রকমের খনিজ পাওয়া যায়।

২. প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকার

? প্রাকৃতিক সম্পদ কত প্রকার?

প্রাকৃতিক সম্পদ প্রধানত দুই ধরনের, যেমন– নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য। নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে যায় না। প্রকৃতি থেকে এগুলোকে প্রতিনিয়ত পাওয়া যায় এবং ব্যবহার করা যায়। যেমন– সূর্যের আলো। অপরদিকে, অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ফলে মজুদ শেষ হয়ে যায়। যেমন– তেল, কয়লা ইত্যাদি।

সূর্যের আলো, বাতাস ও পানি

গ্যাস

পাথর

কয়লা

জ্বালানি তেল

সিলিকা বালু

কাজ: নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ খুঁজে বের করা।

যা করতে হবে:

১. নিচের ছকের মতো একটি ছক আঁকি।

২. উপরের চিত্রগুলোতে দেখানো প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর কোনটি নবায়নযোগ্য ও কোনটি অনবায়নযোগ্য তা নিচের ছকে লিখি।

নবায়নযোগ্য সম্পদ	অনবায়নযোগ্য সম্পদ

সারসংক্ষেপ

নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে যায় না, অন্যদিকে অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে যায়।

বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ

সূর্যের আলো

সূর্য আমাদের আলো ও তাপ দেয়। সূর্যের আলো শক্তির একটি গুরত্বপূর্ণ উৎস। সূর্যের আলো সৌর প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। আমরা বাড়ির ছাদে বা ক্যালকুলেটরে সৌর প্যানেল দেখে থাকি।

বায়ুপ্রবাহ

বায়ুপ্রবাহ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে বায়ুকলের পাখা ঘোরে। বায়ুকল বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্র জেনারেটরের সাথে যুক্ত থাকে। পাখা ঘুরলেই জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

পানির স্রোত

পানির স্রোত ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। পানির স্রোত জেনারেটরের সাথে যুক্ত টারবাইনকে ঘোরায়। ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ

তেল, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস

তেল, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস অনবায়নযোগ্য সম্পদ। প্রকৃতিতে এগুলোর মজুদ রয়েছে। এই সম্পদগুলো একবার ব্যবহার করে শেষ হয়ে গেলে ব্যবহারের জন্য আর পাওয়া যায় না। এগুলো পোড়ালে তাপ উৎপন্ন হয়। রান্না, যানবাহন চালানো ও বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ নানা কাজে এই তাপ ব্যবহার করা হয়।

খনিজ পদার্থ

সোনা, রুপা, লোহা ইত্যাদি ধাতু ভূগর্ভ থেকে পাওয়া যায়। আমরা বিভিন্ন ধাতু দিয়ে গয়না, যন্ত্রপাতি, দালান এবং অন্যান্য অনেক জিনিস তৈরি করি। এসব ধাতু ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত আহরণ করে ফেললে আর নতুন করে পাওয়া যাবে না।

সোনা, রুপা ও লোহা

৩. প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথ ব্যবহারের গুরুত্ব

প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের বেঁচে থাকার এবং সুস্থতার জন্য অপরিহার্য। আমরা বায়ুর মধ্যে ডুবে আছি। বায়ুর সাহায্যে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস চালাই। পানির সাহায্যে আমরা তৃষ্ণা নিবারণ করি। প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য পানির উপস্থিতি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের বাড়ি তৈরির জন্য উপকরণের জোগান দেয়। আমাদের জীবনকে চালনা করার জন্য শক্তি সরবরাহ করে। পৃথিবীতে প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত তাই এদের যথাযথ এবং দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করা খুবই প্রয়োজন।

কাজ: প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের গুরুত্ব খুঁজে বের করি।

যা করতে হবে:

১. নিচের ছকে তিনটি করে নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের নাম লিখি।

২. এই সম্পদগুলো না পেলে, দূষিত হলে, নষ্ট হয়ে গেলে, বা শেষ হয়ে গেলে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবনধারণে কী প্রভাব পড়বে তা নিচের ছকে লিখি।

নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ	মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবনধারণে প্রভাব
১.	
২.	
৩.	

অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ	মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবন ধারণে প্রভাব
১.	
২.	
৩.	

সারসংক্ষেপ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রাকৃতিক সম্পদ খুবই প্রয়োজন। শক্তির উৎস, শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া, বিদ্যুৎ উৎপাদন, জ্বালানিসহ অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে। প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা অকল্পনীয়।

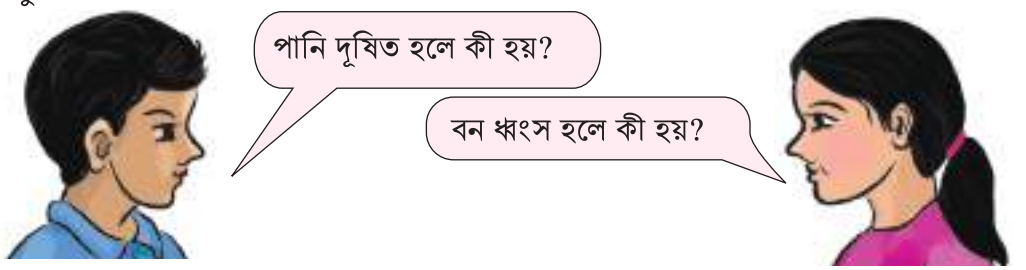

প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথ ব্যবহারের গুরত্ব সম্পর্কে আরও কিছু জানি ...

সম্পদের স্থায়িত্ব, পরিবেশ সুরক্ষা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক কল্যাণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার খুবই প্রয়োজন। যথাযথভাবে সম্পদ ব্যবহার করে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারি।

সম্পদের টেকসই ব্যবহার

প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার বা অপচয় রোধ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাপ্তি নিশ্চিত করে। এই ধারণাটি সম্পদের টেকসই ব্যবহার হিসেবে পরিচিত। পানি, বন আর জীবাশ্ম জ্বালানির মতো প্রাকৃতিক সম্পদ অতি ব্যবহার করা বা বিনষ্ট করা উচিত নয়। যদি আমরা প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার করি, তাহলে ভবিষ্যতেও এগুলো ব্যবহার করতে পারব। যেমন– আমরা যদি অপ্রয়োজনে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখি, গ্যাস দ্রুত ফুরিয়ে যাবে। দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই ব্যবহারের জন্য গ্যাসের অপচয় রোধ করতে হবে।

পরিবেশ রক্ষা

প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার পরিবেশ রক্ষা করতে সাহায্য করে। সম্পদের অত্যধিক ব্যবহার বা অপব্যবহারের ফলে বিভিন্ন ধরনের দূষণ, জীবের বাসস্থান ধ্বংস এবং জলবায়ু পরিবর্তন হতে পারে। যেমন- শক্তির জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়। এতে পৃথিবীর উষ্ণতা বেড়ে যায়। বায়ু এবং সৌরশক্তির মতো নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস ব্যবহার করে আমরা দূষণ কমিয়ে পরিবেশ রক্ষা করতে পারি।

সামাজিক কল্যাণ

প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সামাজিক কল্যাণকেও উৎসাহিত করে। সম্পদগুলোর সুষম ও টেকসই ব্যবহার করা হলে সামাজিক বিরোধ কমে। ফলে সবাই প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ করতে পারে। যেমন– বিশুদ্ধ পানি স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য অপরিহার্য। পানি সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করা গেলে সবার জন্য বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। জীব যতই ছোটো হোক না কেন বাস্তুতন্ত্রে এর ভূমিকা থাকে। বনজ সম্পদসহ অন্যান্য সম্পদের অত্যধিক ব্যবহার গাছপালা এবং প্রাণীদের বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। এর ফলে জীবের বাসস্থান বিনষ্ট হয় এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস পায়। তাই উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রাকৃতিক বাসস্থান রক্ষা খুবই গুরত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সহায়ক।

৪. পরিবেশ পরিবর্তনে মানবসৃষ্ট কারণ ও এর প্রভাব

পরিবেশ হলো আমাদের চারপাশের সবকিছু– উদ্ভিদ, প্রাণী, বায়ু, পানি এবং ভূমি। আমরা বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশের উপর নির্ভর করি। মানুষ প্রায়ই পরিবেশের ক্ষতি করে। এসো দেখি মানুষের কাজকর্ম কীভাবে পরিবেশ পরিবর্তন করে।

? পরিবেশ পরিবর্তনে মানবসৃষ্ট কারণগুলো কী কী?

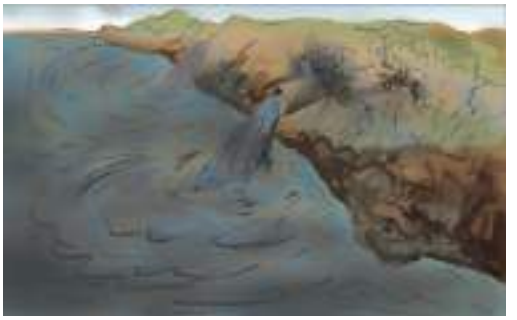

কাজ: মানুষের কর্মকান্ডে পরিবেশের পরিবর্তনের কারণগুলোর তালিকা তৈরি

যা করতে হবে:

১. পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রগুলো ভালো করে লক্ষ করি।

২. চিত্র দেখে এবং দলে আলোচনা করে মানুষের দ্বারা পরিবেশ পরিবর্তনের কারণগুলোর তালিকা তৈরি করি।

৩. নিচের ডায়াগ্রামটিতে পরিবেশের মানবসৃষ্ট বিভিন্ন পরিবর্তন ও কারণ লিখি।

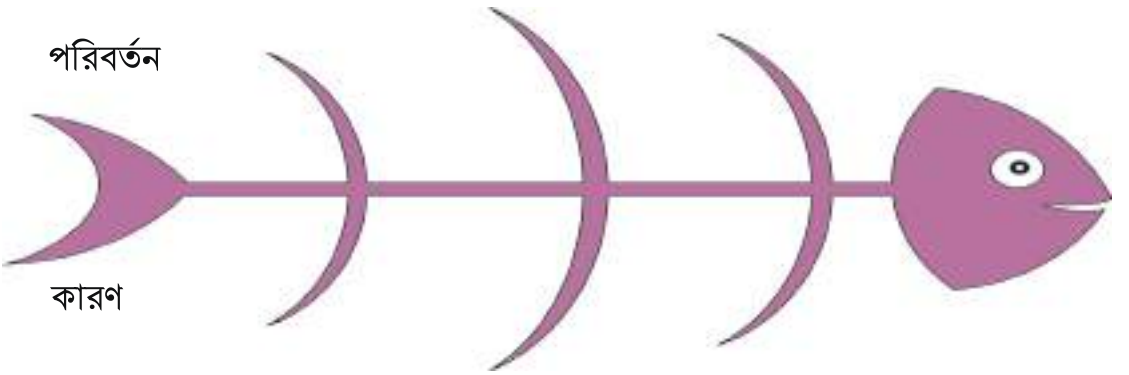

সারসংক্ষেপ

গাছ কেটে এবং বায়ু, পানি, ভূমি দূষিত করে মানুষ পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায়। মানুষের এই ধরনের কাজের ফলে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে অনেক গাছপালা ও জীবের বাসস্থান ধ্বংস হয়। কোনো স্থানের পরিবেশের পরিবর্তন হলে ঐ স্থানের আবহাওয়া ও জলবায়ুরও পরিবর্তন ঘটে। এতে প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট হয়।

কাজ: পরিবেশ পরিবর্তনে মানবসৃষ্ট কর্মকান্ডের প্রভাব ধারণাচিত্রে দেখাই।

যা করতে হবে:

১. পূর্বের কাজে মানবসৃষ্ট যে কারণগুলোর তালিকা তৈরি করেছিলাম, সেগুলো পরিবেশ পরিবর্তনে কী প্রভাব ফেলে তা নিয়ে দলে আলোচনা করি।

২. অপর পৃষ্ঠার ধারণাচিত্রের শূন্যস্থানে পরিবেশ পরিবর্তনে মানবসৃষ্ট কর্মকান্ডের প্রভাবগুলো লিখি।

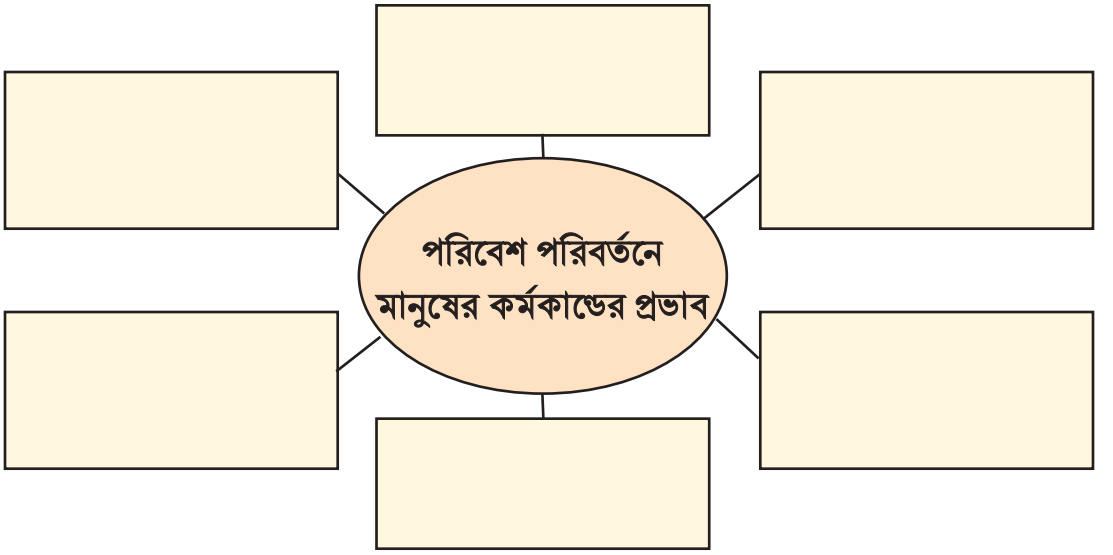

পরিবেশ পরিবর্তনে মানবসৃষ্ট কারণ ও এর প্রভাব সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

বনভূমি ধ্বংস

বন উজাড় করা মানে বনের একটি বিশাল এলাকার গাছ কেটে ফেলা। গাছপালা আমাদের অক্সিজেন দেয়। এরা অক্সিজেন ত্যাগ করে বায়ুকে নির্মল করে। প্রাণীদের বসবাস করার জায়গা দেয়। বন উজাড় করার ফলে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে। এতে জীবের বাসস্থান নষ্ট হয় এবং জীবের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। কোনো স্থানের বন উজাড় করে ফেললে ঐ স্থানের মাটির উপরের আবরণ সরে যায়। এতে বনের মাটির ক্ষয় হয়, মাটি উর্বরতা হারায়। ঐ স্থানে নতুন গাছ জন্মাতে পারে না।

গাছপালা কেটে বন উজার

দূষণ

মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশের উপাদানগুলো দূষিত হয়। বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক পদার্থ বাতাস, পানি ও মাটিতে প্রবেশ করে দূষণ ঘটায়। পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের দূষণ ঘটে। যেমন–

বায়ু দূষণ: গাড়ি ও কলকারখানা চালানো এবং অন্যান্য কাজে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বাতাসে ধোঁয়া এবং রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়ে বায়ু দূষণ ঘটায়। বায়ু দূষণের ফলে জীবের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

পানি দূষণ: নানা রকমের আবর্জনা, রাসায়নিক পদার্থ ও বর্জ্য পদার্থ দিয়ে নদী-নালা, খাল-বিল, হ্রদ, সাগর, ও মহাসাগরের পানি দূষিত হয়। এতে মাছসহ অন্যান্য জলজ জীবের বসবাসের পরিবেশ নষ্ট হয় ও এদের বিলুপ্তি ঘটে।

ভূমি দূষণ: মাটিতে ময়লা আবর্জনা, কারখানার বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ মিশে মাটিকে দূষিত করে। ভূমি দূষণের ফলে গাছপালা এবং প্রাণীদের জীবন বিপন্ন হয়।

৫. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উপায়

প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা এবং এর পরিকল্পিত ব্যবহারই হচ্ছে সংরক্ষণ। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করলে তা দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করা যায়। ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ পায়।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উপায়গুলো কী কী?

কাজ: কোন কোন বস্তুর ব্যবহার কমানো, পুনর্ব্যবহার, পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা যায় তা খুঁজে বের করি।

যা করতে হবে:

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য বাড়ি ও নিকট পরিবেশে যেসব বস্তুর ব্যবহার কমাতে পারি, পুনর্ব্যবহার করতে পারি, পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করতে পারি তা দলে আলোচনা করে চিহ্নিত করি ও নিচের ছকে লিখি।

ব্যবহার কমানো	পুনর্ব্যবহার করা	পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করা

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য আমরা নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি। যেমন– বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা। পানির অপচয় রোধ করতে নষ্ট হওয়া পানির কলগুলো দ্রুত মেরামত করা। গ্যসের অপচয় রোধে রান্না শেষে গ্যাসের চুলা বন্ধ আছে কি না তা নিশ্চিত করা। ভূমিক্ষয় কমাতে গাছ লাগানো। বন ধ্বংস বা বন্যপ্রাণী শিকারের ঘটনা ঘটলে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো। আমরা বস্তুর ব্যবহার কমিয়ে, পুনর্ব্যবহার করে, ফেলে দেয়া বস্তু থেকে নতুন বস্তু তৈরি করে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারি।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। এতে ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা পায়। অতি ব্যবহার কমিয়ে, পুনর্ব্যবহার ও অপচয় রোধ করে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা যায়। ফলে পরিবেশে আর্বজনার পরিমাণ কমে ও শক্তি সংরক্ষিত হয়। বিভিন্ন উপায়ে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা যায়, যেমন–

সম্পদের অতি ব্যবহার কমানো

সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের একটি ভালো উপায়। আমরা শক্তির ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি। যেমন– প্রয়োজন শেষে বৈদুতিক বাতির সুইচ বন্ধ করা; ধোয়ামোছা বা গোসলের সময় পানির অপচয় রোধ করা।

সম্পদের পুনর্ব্যবহার করা

ব্যবহৃত কোনো জিনিসকে ফেলে না দিয়ে আমরা অন্য কোনো কাজে এর পুনর্ব্যবহার করতে পারি। যেমন– পুরোনো কাপড়, খেলনা ফেলে না দিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়া। প্লাস্টিকের ফেলে দেওয়া বোতল বা কৌটা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা। কোনো জিনিস ভেঙে গেলে তা মেরামত করে ব্যবহার করা।

সম্পদের পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করা

রিসাইকেল বা সম্পদের পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পুরানো বস্তুকে নতুন রূপ দেওয়া যায়। এভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ কমানো যায়। কাগজ, প্লাস্টিক, গ্লাস ও বিভিন্ন ধাতু পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ কমানো সম্ভব। যেমন– পুরানো কাগজ থেকে মন্ড তৈরি করে পুনরায় কাগজ তৈরি করে ব্যবহার করা।

অনবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার কমানো

মানুষ প্রধানত অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন– তেল, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করে। এসব সম্পদ একবার ব্যবহার করলেই নিঃশেষ হয়ে যায়। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের একটি ভালো উপায় হলো, অনবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে নবায়নযোগ্য সম্পদ যেমন– সূর্যের আলো, বায়ুপ্রবাহ, পানির স্রোত ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করা।

৬. নিজ পরিবেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহার

প্রাকৃতিক সম্পদ পরিমিত ব্যবহার করার অর্থ হলো এগুলোর সাশ্রয়ী ব্যবহারের পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার রোধ করা। প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহার করলে ও পরিবেশের যথাযথ যত্ন নিলে আমাদের পৃথিবী রক্ষা পাবে। আমরা সম্পদের পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারি।

আমরা কীভাবে নিজ পরিবেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহার করতে পারি?

পানির অপচয়

বিদ্যুতের অপচয়

গ্যাসের অপচয়

কাগজের অপচয়

কাজ: প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহারের উপায় বের করি

যা করতে হবে:

১. উপরের চিত্রগুলো ভালো করে লক্ষ করি।

২. চিত্রগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহার করা হয়নি। চিত্রে দেখানো প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহার কীভাবে নিশ্চিত করা যায় তা সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

৩. নিচের ছকটি পূরণ করি।

প্রাকৃতিক সম্পদ	পরিমিত ব্যবহার
পানি	
বিদ্যুৎ	
গ্যাস	
কাগজ	

সারসংক্ষেপ

আমাদের নিজেদের ইচ্ছা ও চর্চা এবং সামাজিক সচেতনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ও দায়িত্বশীল ব্যবহার করতে পারি।

সম্পদের পরিমিত ব্যবহারের সচেতনতা

প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহার শুধু একজনের কাজ নয়, সবার দায়িত্ব। আমাদের পরিবার, বন্ধু, স্কুলের শিক্ষক সবাইকে সচেতন হতে হবে। আমরা আমাদের সহপাঠীসহ অন্যান্য বন্ধুদের কীভাবে পানি বা বিদ্যুৎ বাঁচানো যায় সে বিষয়ে সচেতন করব। সবাই মিলে যদি সচেতন হই, তাহলে পৃথিবী আরও সুন্দর ও বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করি

ক. প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন যা কিছু মানুষের কাজে লাগে তাই ---------- ।

খ. অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ একবার ব্যবহার করলে---------- হয়ে যায়।

গ. প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ভবিষ্যৎ ---------- জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাপ্তি নিশ্চিত করে।

ঘ. মানুষের কর্মকান্ডের ফলে পরিবেশের ---------- দূষিত হয়।

ঙ. আমরা শক্তির ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ ---------- করতে পারি।

২। বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল করি।

বাম	ডান
কাঠের প্রধান উৎস হলো	পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায়
নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ	সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সহায়ক।
প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার	বনের গাছপালা।
মানুষ গাছ কেটে, বায়ু, পানি, ভূমির দূষণ ঘটিয়ে	এগুলোর সাশ্রয়ী ব্যবহারের পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার রোধ করা।
প্রাকৃতিক সম্পদ পরিমিত ব্যবহার করার অর্থ হলো	ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

৩। শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ নির্বাচন করি।

	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষ তৈরি করতে পারে না।		
বায়ুপ্রবাহ অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ।		
সম্পদের টেকসই ব্যবহার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাপ্তি নিশ্চিত করে।		
কাগজ থেকে মন্ড তৈরি করে পুনরায় কাগজ তৈরি করা হচ্ছে সম্পদের পুনর্ব্যবহার।		

৪। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক) প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে?

খ) কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস কী ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ?

গ) বনজ সম্পদ কীভাবে পরিবেশকে বাসযোগ্য করে তোলে?

ঘ) পানি দূষিত হলে জীবের ওপর কী প্রভাব পড়ে?

ঙ) কীভাবে গৃহস্থালি কাজে পানির অপচয় কমানো যায়?

৫। বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক) বাংলাদেশে কী কী প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে? একটি তালিকা তৈরি করো।

খ) বন ধ্বংস হলে পরিবেশের কী ক্ষতি হয়? ব্যাখ্যা করো।

গ) নিজের বাড়িতে বা স্কুলে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণে ভূমিকা রাখার চারটি উপায় লেখো।

ঘ) ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করতে হলে আমাদের কী কী কাজ করা উচিত– যুক্তি দিয়ে লেখো।

অধ্যায় ৮

মহাবিশ্ব

রাতে আকাশের দিকে তাকালে আমরা কী দেখতে পাই? রাতের আকাশে সাধারণত চাঁদ এবং অসংখ্য তারা দেখতে পাই। দিনের আকাশে কেন এদের দেখা যায় না? দিনের আকাশে সূর্যের আলো অনেক বেশি, সে কারণে আমরা এদের দেখতে পাই না। আমরা শুধু সূর্যকেই দিনের বেলা দেখতে পাই। সমস্ত গ্রহ, সৌরজগৎ, নক্ষত্র, ছায়াপথ নিয়ে মহাবিশ্ব গঠিত।

১. সৌরজগৎ

সূর্য এবং তার পরিবারের সদস্য মিলে তৈরি হয় সৌরজগৎ। সৌরজগতের সদস্যরা হচ্ছে– সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ এবং অন্যান্য মহাকাশীয় পদার্থ। গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে গ্রহগুলোর নাম হচ্ছে– **বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন**। প্রত্যেক গ্রহের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অনেক গ্রহের উপগ্রহ রয়েছে যা তাদের চারপাশে ঘোরে। পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহের নাম চাঁদ।

? সৌরজগতের গঠন কেমন?

কাজ ১: খেলার মাঠে দৌড়ের মাধ্যমে সৌরজগৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ।

কী কী দরকার: খোলা মাঠ, গ্রহের নাম লেখা প্ল্যাকার্ড।

কী করতে হবে

১. নয় জন সহপাঠী নিয়ে একটি দল গঠন করি।
২. সূর্যের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য একজনকে দল থেকে লটারির মাধ্যমে বাছাই করি। তার হাতে সূর্য লেখা প্ল্যাকার্ড দেই। সূর্যের ভূমিকা নেওয়া বন্ধুটি একটি মাঠের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকবে।
৩. বাকি আট জন বন্ধুর প্রত্যেকে লটারির মাধ্যমে সৌরজগতের ৮টি গ্রহের নাম তুলবে। তাদের হাতে এক একটি গ্রহের নাম লেখা প্ল্যাকার্ড ধরা থাকবে।
৪. বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন গ্রহের প্ল্যাকার্ডধারী সহপাঠীরা পরপর দাঁড়াই। প্ল্যাকার্ড উঁচু করে কল্পিত সূর্যের চারদিকে গোলাকার পথে দৌড়াই।
৫. দৌড়ের পরে সবাই একত্রিত হই এবং সবার কেমন লাগল তা নিয়ে আলোচনা করি।

- সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে সবাই কি একই দূরত্ব অতিক্রম করেছে? একবার সূর্যকে ঘুরে আসতে কার সবচেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়েছিল?

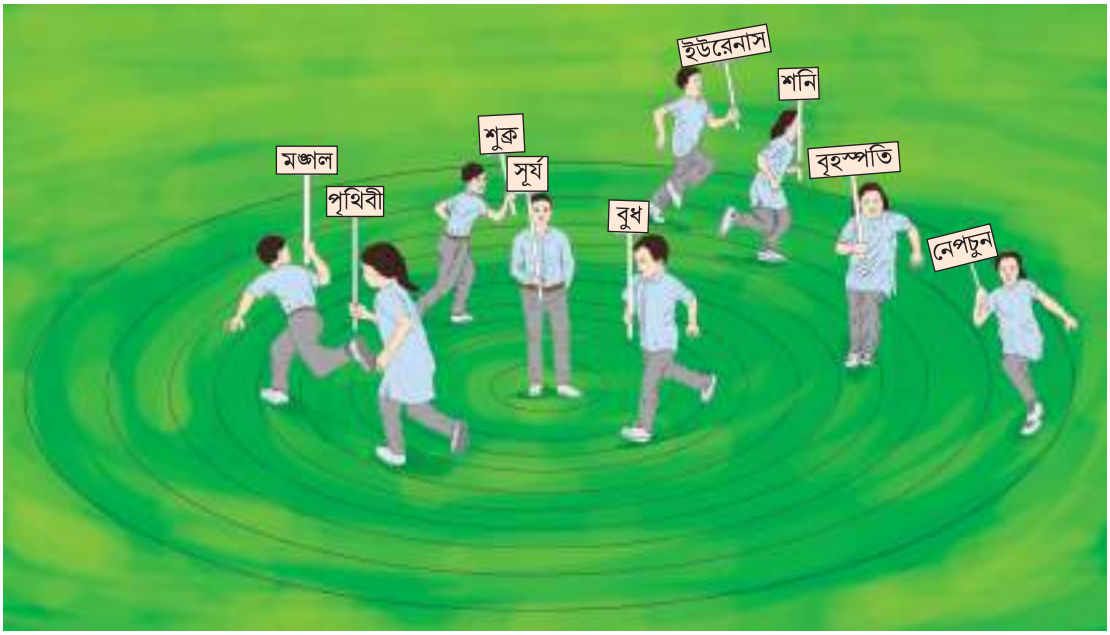

খেলার মাঠে সৌরজগৎ

- একবার ঘুরলে সব ছাত্রের কি একই সময় লেগেছিল? কার একবার ঘুরে শুরুর অবস্থানে ফিরে আসতে সবচেয়ে কম সময় লেগেছে?

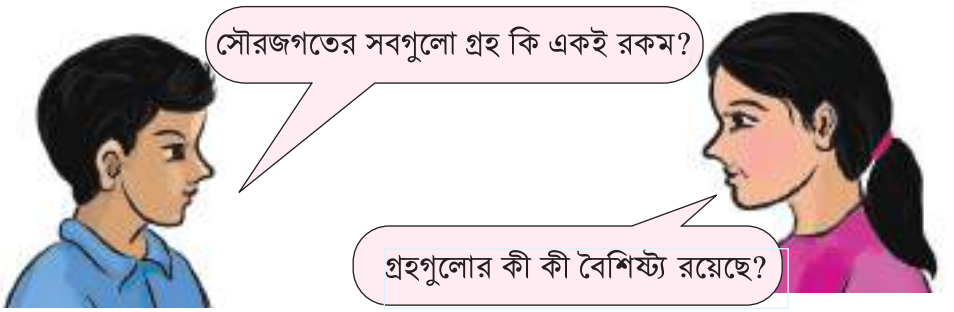

কাজ ২: সৌরজগতের মডেল তৈরি করা।

কী কী দরকার: বিভিন্ন রঙের কাগজ, সাদা সুতা, কলম।

যা করতে হবে:

১. একটি সমান জায়গায় একটি কালো কাগজ রাখি।

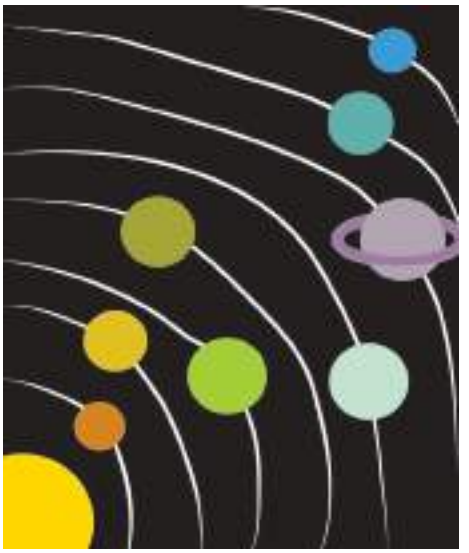

গ্রহের নাম	এমন বৈশিষ্ট যা অন্য গ্রহের নেই

২. কালো কাগজের মাঝখানে সূর্য বোঝায় এমন একটি বড়ো গোল হলুদ কাগজ রাখি।

৩. বিভিন্ন রঙের রঙিন কাগজ কেটে সূর্যের চারপাশের গ্রহগুলো বোঝায় এমন আটটি বৃত্ত বানাই এবং এদের উপর নাম লিখি।

৪. যথেষ্ট লম্বা করে সাদা সুতা কাটি। প্রতিটি সুতা আঠা দিয়ে সমান ফাঁকে এবং একে অপরের সাথে সমান দূরে রেখে বৃত্ত তৈরি করি। এগুলো হলো কক্ষপথ।

৫. সূর্য থেকে দূরত্ব অনুযায়ী সাদা সুতার উপর বিভিন্ন গ্রহকে বসাই।

৬. একটি রঙিন কাগজে উপরের মতো করে ছক আঁকি এবং প্রতিটি গ্রহের এমন বৈশিষ্ট্য লিখি যা অন্য কোনো গ্রহে নাই।

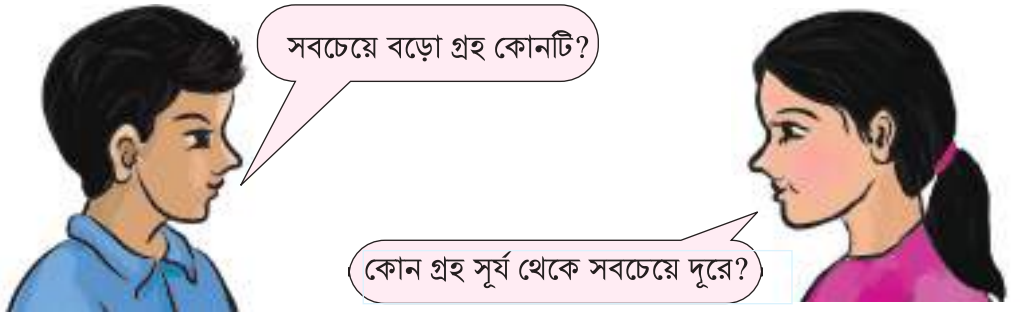

সারসংক্ষেপ

সৌরজগতের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলো ঘুরে। কাছের গ্রহগুলোর তুলনায় দূরের গ্রহগুলোর সূর্যের চারদিকে ঘুরে শুরুর অবস্থানে ফিরে আসতে বেশি সময় লাগে।

সৌরজগতের গঠন সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

আমরা জেনেছি সৌরজগতের কেন্দ্রে সূর্য অবস্থান করে। সূর্যকে কেন্দ্র করে আটটি গ্রহ এবং এদের উপগ্রহগুলো আবর্তিত হয়। এসো সৌরজগতের গ্রহগুলোর বৈশিষ্ট্য জেনে নিই।

বুধ: বুধ সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ। সৌরজগতের সবচেয়ে ছোটো গ্রহ হলো বুধ। এর কোনো উপগ্রহ নেই। এর পৃষ্ঠতে রয়েছে পাথর, গর্ত এবং সমতল ভূমি । মাত্র ৮৮ দিনে এটি সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসে।

শুক্র: শুক্রের আকার এবং গঠন পৃথিবীর অনুরূপ। কিন্তু এর পরিবেশ একদম ভিন্ন। খুব ভারী এবং ঘন বায়ুমণ্ডল থাকার কারণে গ্রহটি তাপ ধরে রাখে। ফলে সৌরজগতের এই গ্রহের তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি। এর কোনো উপগ্রহ নেই। শুক্র গ্রহকে শুকতারা বা সন্ধ্যাতারাও বলে। সকালে শুকতারা পূর্ব আকাশে দেখা যায়, তখন একে বলি ভোরের তারা। আবার সন্ধ্যায় এটি থাকে পশ্চিম আকাশে, তখন তাকে বলি সন্ধ্যাতারা।

পৃথিবী: পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যেখানে তরল পানি আছে এবং এর পরিবেশ জীবদের বসবাসের উপযোগী। এর একমাত্র উপগ্রহ হলো চাঁদ। পৃথিবী ৩৬৫ দিনে একবার সূর্যের চারপাশে ঘুরে আসে। এই সময়কালকে আমরা বলি এক বছর।

মঙ্গল: মঙ্গালের পৃষ্ঠ কমলাভ-লাল বলে মঙ্গাল গ্রহকে লাল গ্রহ হিসেবে নামকরণ করা হয়। অত্যন্ত ঠান্ডা এই গ্রহের পৃষ্ঠ দেখতে অনেকটা মরুভূমির মতো। মঙ্গল গ্রহ ৬৮৭ দিনে একবার সূর্যের চারপাশে ঘুরে আসে। মঙ্গালের বায়ুমণ্ডল খুব পাতলা। মঙ্গালের পৃষ্ঠের নিচে বরফ আছে। এই গ্রহের দুটি ছোটো উপগ্রহ রয়েছে।

বৃহস্পতি: আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে বড়ো গ্রহ। বৃহস্পতিতে গত কয়েকশত বছর যাবৎ সব সময় একটি সুবিশাল ঝড় ঘূর্ণায়মান রয়েছে। এই গ্রহের ৯৫টি উপগ্রহ আছে। এর মধ্যে চারটি উপগ্রহ সৌরজগতের সবচেয়ে বড়ো উপগ্রহ।

শনি: এটি সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। শনির আছে একটি সুন্দর বলয় যেটি বরফ আর পাথরের খণ্ড দিয়ে তৈরি। এর ১৪৬টি উপগ্রহ রয়েছে।

মঙ্গাল

শনি

পৃথিবী

নেপচুন

ইউরেনাস: এটি পাথরের উপর পানি, মিথেন এবং অ্যামোনিয়ার বরফ দিয়ে গঠিত। এটি সৌরজগতের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ। এর বায়ুমন্ডলে থাকা মিথেন গ্যাসের কারণে ইউরেনাসকে দেখতে নীল মনে হয়। এই গ্রহের ২৮টি উপগ্রহ রয়েছে ।

নেপচুন: নেপচুন সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ। এর গঠন ও বায়ুমন্ডল ইউরেনাসের মত। এটি দেখতেও ইউরেনাসের মতোই নীল। সৌরজগতের মধ্যে সবচেয়ে জোরে বায়ুপ্রবাহ এবং ঝড় হয় এই গ্রহে। নেপচুনের রয়েছে ১৬টি উপগ্রহ।

২. পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ

সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন গ্রহরা ঘোরে, তেমনি গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘোরে উপগ্রহ। উপগ্রহের আকার গ্রহ থেকে অনেক ছোটো। উপগ্রহ দুই প্রকার: প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বা মানুষের পাঠানো। পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ হলো চাঁদ।

কৃত্রিম উপগ্রহ হলো একটি মানুষের তৈরি বস্তু যা পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। এগুলো স্যাটেলাইট নামে পরিচিত। যোগাযোগ, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, বৈজ্ঞানিক এবং সামরিক গবেষণাসহ বিভিন্ন কাজের জন্য এই স্যাটেলাইটগুলো মহাকাশে পাঠানো হয়। বাংলাদেশেরও একটি স্যাটেলাইট আছে যার নাম ‘বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১’।

চাঁদের আকৃতি কীভাবে পরিবর্তিত হয়?

কাজ: চাঁদ পর্যবেক্ষণ

যা করতে হবে:

১. আমরা বিভিন্ন সময়ে রাতের আকাশে কী কী আকৃতির চাঁদ দেখেছি, তা খাতায় আঁকি।

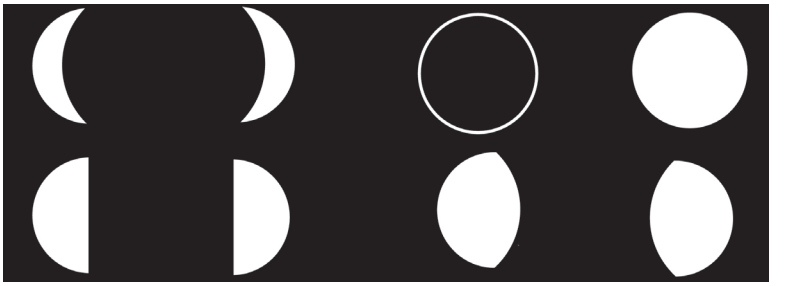

চাঁদের বিভিন্ন আকৃতি

২. উপরের চিত্রের বিভিন্ন আকৃতির চাঁদের সাথে নিজের আঁকা চাঁদের চিত্রগুলো মিলাই।

৩. চিত্রে থাকা চাঁদের কোন আকৃতিগুলো আমরা দেখতে পেয়েছি এবং কোনগুলো দেখতে পাইনি, তা চিহ্নিত করি।

সারসংক্ষেপ

আমরা যদি রাতে ভালোভাবে চাঁদ দেখি তাহলে দেখতে পাব চাঁদের আকৃতি কখনো কখনো বড়ো এবং গোল। আবার কখনো কখনো তা ছোটো এবং অর্ধ-গোলাকার।

চাঁদের আকৃতি পরিবর্তন সম্পর্কে আরও কিছু জানি ...

চাঁদের উজ্জ্বল অংশের আকৃতি পরিবর্তনই হচ্ছে চাঁদের দশা। চাঁদের আটটি দশা বা পর্যায় রয়েছে। একটি অবস্থা থেকে শুরু করার পর প্রায় প্রতি ২৯.৫ দিনে চাঁদ ঠিক তার আগের অবস্থায় ফিরে যায়।

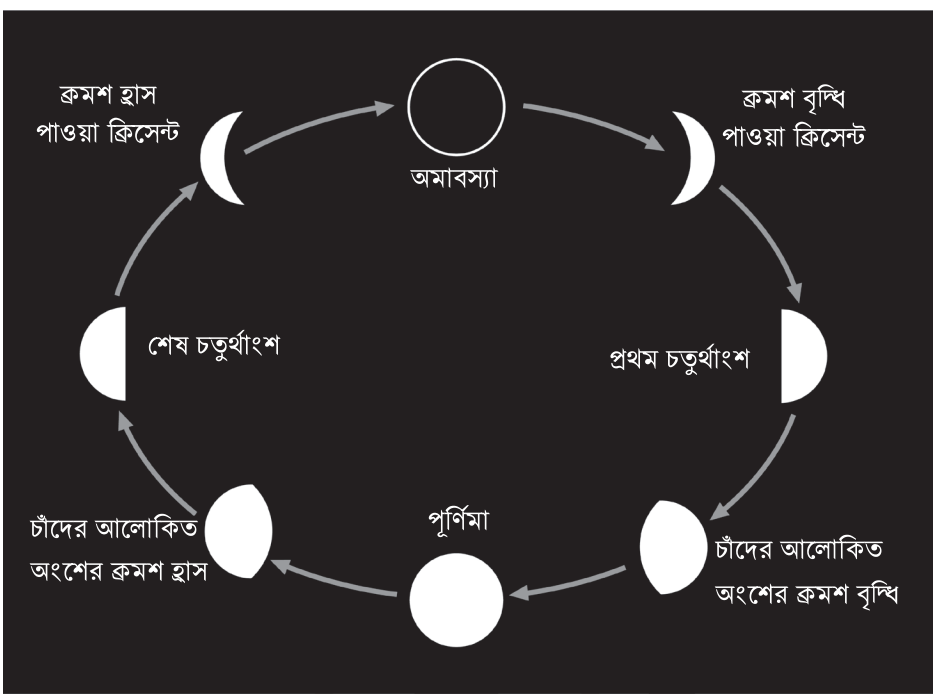

চাঁদের আটটি দশা

অমাবস্যা: এ সময় চাঁদের যে দিকটি পৃথিবীর দিকে থাকে সে দিকটি সম্পূর্ণ ছায়ায় ঢেকে যায়। ফলে পৃথিবী থেকে চাঁদ দেখা যায় না। যখন চাঁদ পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে অবস্থান করে, তখন এটি ঘটে।

ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া ক্রিসেন্ট: অমাবস্যার পরে চাঁদের পৃষ্ঠ ধীরে ধীরে আরও বেশি উজ্জ্বল হয়। একে বলে ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া **ক্রি**সেন্ট।

প্রথম চতুর্থাংশ: চাঁদ যখন পৃথিবীর চারপাশে তার কক্ষপথের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ঘুরে আসে, তখন চাঁদের ভূমির অর্ধেক আলোকিত হয়। ফলে চাঁদকে অর্ধ-গোলাকার আকৃতির দেখায়।

আলোকিত অংশের ক্রমশ বৃদ্ধি: প্রথম চতুর্থাংশের পরে ধীরে ধীরে চাঁদের পৃষ্ঠের অর্ধেকেরও বেশি আলোকিত হয়ে যায়।

পূর্ণিমা: এ সময় চাঁদ সম্পূর্ণ আলোকিত হয় এবং পৃথিবী থেকে চাঁদকে পুরোপুরি গোলাকার দেখা যায়। পূর্ণিমার সময় পৃথিবী সূর্য এবং চাঁদের মাঝখানে অবস্থান করে।

পরবর্তী পর্যায়গুলো হলো: আলোকিত অংশের ক্রমশ কমে যাওয়া, শেষ চতুর্থাংশ এবং ক্রমশ কমে যাওয়া ক্রিসেন্ট। এভাবে এই পর্যায়গুলো একের পর এক ঘটতে থাকে যা পুরোপুরি সম্পূর্ণ হতে প্রায় ২৯.৫ দিন সময় লাগে। এটি চান্দ্রমাস নামে পরিচিত।

পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা কীভাবে হয়?

কাজ: পূর্ণিমা এবং অমাবস্যার মডেল তৈরি করা।

কী কী দরকার: বিভিন্ন রঙের কাগজ, সাদা সুতা, কলম।

কী করতে হবে:

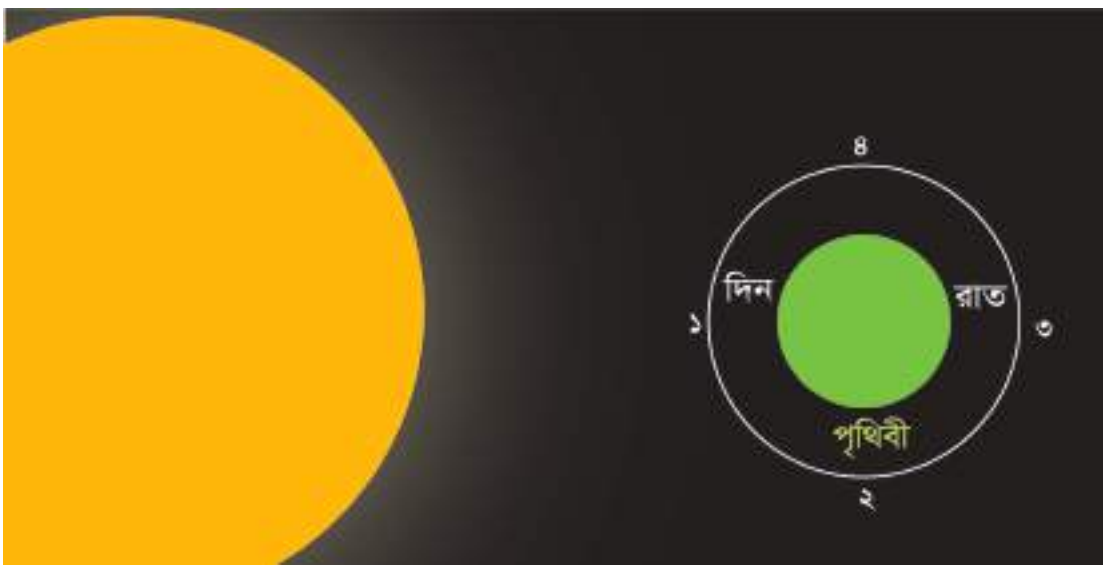

১. একটি সমতল পৃষ্ঠে কালো রঙের কাগজ রাখি।
২. কালো রঙের কাগজের ঠিক মাঝখানে সূর্য নির্দেশ করে এমন একটি গোলাকার কমলা রঙের কাগজ রাখি।
৩. সবুজ রঙের কাগজ গোল করে কেটে সূর্যের পার্শে রাখি এবং মনে করি এটা পৃথিবী।
৪. যথেষ্ট লম্বা করে সাদা সুতা কাটি। আঠা দিয়ে পৃথিবীর চারদিকে বৃত্ত তৈরি করি। এগুলো হলো কক্ষপথ।
৫. হলুদ রঙের কাগজ গোল করে কেটে দুটি চাঁদ বানাই এবং একটির উপর লিখি পূর্ণিমা এবং অন্যটির উপর লিখি অমাবস্যা।
৬. চাঁদকে কক্ষপথের ১,২,৩ এবং ৪ চিহ্নিত স্থানগুলোর মধ্যে সঠিক স্থানে রেখে পূর্ণিমা এবং অমাবস্যার জন্য দুটি মডেল তৈরি করি।
৭. মডেল দেখে নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবি ছকে নিচের প্রশ্ন দুটির উত্তর লিখি।
    - পূর্ণিমার সময় চাঁদকে কেন আলোকিত দেখায়?
    - অমাবস্যায় চাঁদকে কেন অন্ধকার দেখায়?

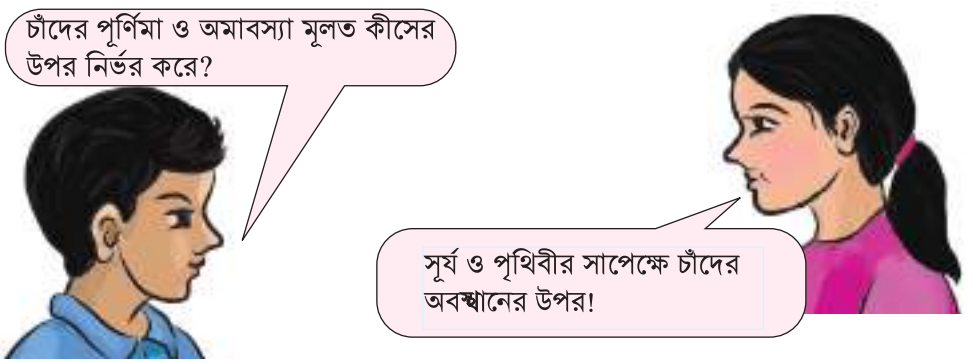

সারসংক্ষেপ

অমাবস্যার সময় চাঁদ, সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে থাকে। এই অবস্থানে চাঁদের আলোকিত অংশটি পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। পূর্ণিমার সময় পৃথিবী, সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে থাকে। এ সময় চাঁদের সম্পূর্ণ আলোকিত অংশটি পৃথিবী থেকে দেখা যায়।

চাঁদ কীভাবে আলোকিত হয়?

আমরা কি কখনো রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে ভেবে দেখেছি চাঁদের সুন্দর আলোর পিছনে কী রহস্য লুকিয়ে আছে? আকাশে কেন এটি এত উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে? এটার কি নিজস্ব আলো আছে?

কাজ : চাঁদ আলোকিত হওয়ার কারণ অনুধাবন।

যা করতে হবে:

১. নিচের ছকের মতো একটি ছক আঁকি।

আলো উৎপন্ন করে	আলো উৎপন্ন করে না

২. উপরের ছবিগুলো দেখি।

৩. এদের মধ্যে কারা নিজেরা আলো তৈরি করে এবং কারা নিজেরা আলো তৈরি করে না, তা ছকে লিখি।

৪. নিচের প্রশ্নটি নিয়ে দলে আলোচনা করি:
যারা আলো তৈরি করে না, তাদের কেন আমরা দেখতে পাই?

সারসংক্ষেপ

কিছু পদার্থ আলো তৈরি করে। কিছু পদার্থ নিজস্ব আলো উৎপন্ন করে না। তবু আমরা এদের দেখতে পাই কারণ তারা অন্যের আলোকে প্রতিফলিত করে।

চাঁদ কীভাবে আলোকিত হয় সে সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

চাঁদের এর নিজের কোনো আলো নেই; এটি আলোর জন্য সূর্যের উপর নির্ভরশীল। সূর্যকে আকাশে একটি বিশাল টর্চলাইট হিসেবে কল্পনা করা যায়। চাঁদের উপরিভাগ পাথর এবং ধুলো দ্বারা আবৃত, যা আয়নার মতো সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে। পৃথিবীর দিকে সেই আলো ফিরে আসে। এই কারণে আমরা রাতের আকাশে চাঁদ দেখতে পাই। সূর্য চাঁদের একপাশ আলোকিত করলেও সূর্যের বিপরীত দিকে থাকা চাঁদের অংশটি সব সময় অন্ধকার থাকে।

এখন ভেবে দেখি তো, আমরা যদি চাঁদে থাকতাম, তবে সেখান থেকে কি পৃথিবীকে দেখতে পেতাম? অবশ্যই, চাঁদের মতোই পৃথিবীও সূর্যের আলো কিছুটা প্রতিফলিত করে। ফলে চাঁদ থেকে পৃথিবীকে দেখা যায়।

চাঁদের আকাশে পৃথিবীর উদয় হয়েছে

? চাঁদের উপরিভাগে কী কী আছে?

কাজ : চাঁদের পৃষ্ঠটি কী দ্বারা গঠিত তা কাছে থেকে তোলা ছবি হতে পর্যবেক্ষণ।

যা করতে হবে:

চাঁদের উপরিভাগের ছবিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি।

দূর থেকে তোলা ছবি

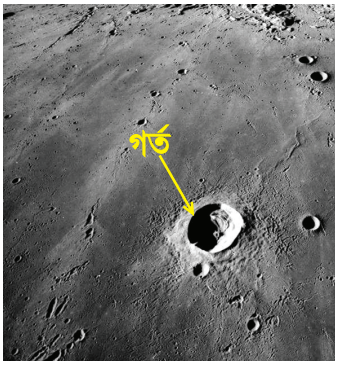

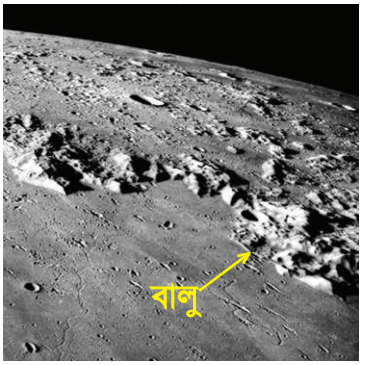

কাছে থেকে তোলা ছবি

চাঁদের উপরিভাগের সাথে পৃথিবীর উপরিভাগের পার্থক্যগুলো নিচের ছকে লিখি।

চাঁদ	পৃথিবী

সারসংক্ষেপ

কাছে থেকে দেখলে চাঁদের পৃষ্ঠটিতে বিভিন্ন আকারের গর্ত দেখা যায়, যা পৃথিবীতে নেই। এছাড়া চাঁদের পৃষ্ঠে বালুর স্তর রয়েছে। পৃথিবীর মতো চাঁদে বাতাস আর পানি নেই। তাই চাঁদে গাছপালাও নেই।

কাজ : চাঁদের পৃষ্ঠটি কী দিয়ে তৈরি তা দূর থেকে পর্যবেক্ষণ।

যা করতে হবে:

চাঁদের উপরিভাগের ছবিটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি।

দূর থেকে তোলা চাঁদের ছবি

সহপাঠীর সাথে আলোচনা করি এবং চাঁদের উজ্জ্বলতা সব জায়গায় সমান কি না তা লক্ষ করে নিচের ছকে লিখি।

১.
২.

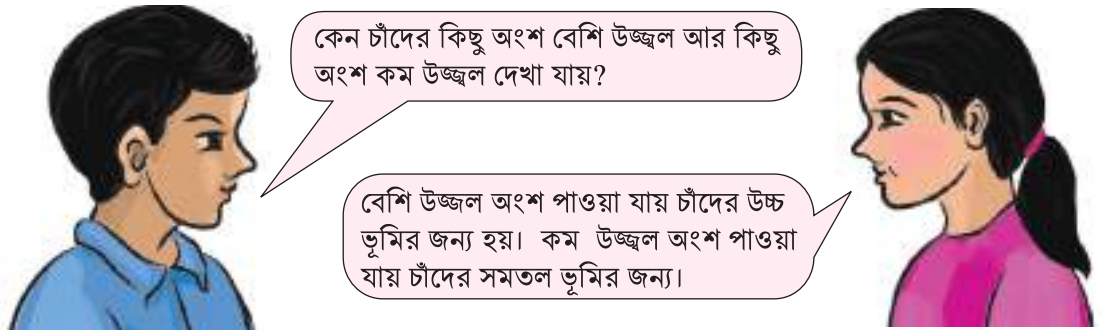

সারসংক্ষেপ

খালি চোখে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালে দেখা যায় চাঁদের উজ্জ্বল অংশের পাশাপাশি কম উজ্জ্বল অংশও রয়েছে। চাঁদের দিকে তাকালে যে কম উজ্জ্বল অংশ দেখা যায়, যাকে আমরা বলি চাঁদের কলঙ্ক।

দূর থেকে পুরো চাঁদকে দেখলে এর গায়ে হালকা ও গাঢ় দুই রঙের অঞ্চল দেখা যায়। চাঁদের পৃষ্ঠের হালকা রঙের জায়গাগুলো হলো উচ্চভূমি। চাঁদের পৃষ্ঠের অন্ধকার জায়গাগুলো হলো সমতল ভূমি।

পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ সম্পর্কে আরও কিছু জানি ...

বহু বছর ধরে মহাকাশ থেকে উল্কা এবং অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তু চাঁদের গায়ে প্রবল বেগে পড়েছে। ফলে বিভিন্ন আকারের গর্তগুলো তৈরি হয়েছে। সেই সাথে উৎপন্ন হয়েছে বিশেষ ধরনের বালু, যাকে রেগোলিথ বলা হয়। এটি চাঁদের পৃষ্ঠকে ধুলোময় ময়লার একটি স্তরের মতো ঢেকে রাখে। চাঁদ এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠের মধ্যে আরো একটি বড়ো পার্থক্য হলো চাঁদে কোনো পানি পাওয়া যায় না। চাঁদে পৃথিবীর মতো বাতাস এবং বৃষ্টিপাত নেই। আমাদের পৃথিবীতে যেমন পাথর আছে, চাঁদেরও তা আছে।

দূর থেকে তোলা চাঁদের ছবিতে হাল্কা রঙের অঞ্চলগুলো হলো উচ্চভূমি। এরা চাঁদের পৃষ্ঠের বেশিরভাগ অংশ তৈরি করে। এই অঞ্চলগুলো অ্যালুমিনিয়াম এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ এক ধরনের শিলা দিয়ে গঠিত, যাতে আলো ভালোভাবে প্রতিফলিত হয়।

চন্দ্রপৃষ্ঠ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ‘মারিয়া’ নামক কালো, মসৃণ সমভূমি। এখানকার শিলা প্রাচীন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হতে তৈরি। আশপাশের উচ্চভূমির তুলনায় এখানে থাকা বালু কম প্রতিফলন করে বলে এদের তুলনামূলকভাবে কালো দেখায়।

৩. ছায়াপথ

মহাবিশ্ব অনেক বড়ো। অসংখ্য ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি দিয়ে মহাবিশ্ব গঠিত। মহাবিশ্বের অতি ক্ষুদ্র অংশ যাতে নক্ষত্রের বিশাল সমাবেশ রয়েছে তাকেই গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ বলে। আমাদের সৌরজগৎ যে ছায়াপথে রয়েছে তার নাম মিল্কিওয়ে বা আকাশগঙ্গা।

সূর্য সৌরজগতের একমাত্র নক্ষত্র। নক্ষত্র হচ্ছে জ্বলন্ত গাসের একটি বিশাল কুন্ডলী যার নিজস্ব আলো, তাপ এবং অন্যান্য শক্তি রয়েছে। অন্যান্য নক্ষত্র সূর্য থেকে ছোটো দেখায় কারণ এগুলো অনেক দূরে অবস্থিত।

মিল্কিওয়ে ছায়াপথ

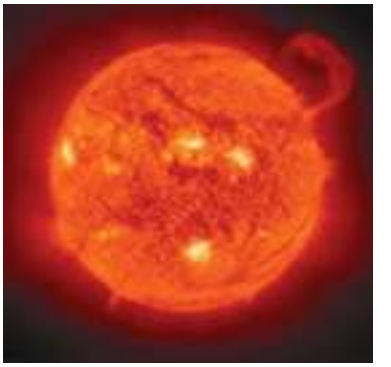

সূর্য

মহাবিশ্ব কতটা বড়ো?

কাজ ১: নক্ষত্রের তুলনায় ছায়াপথের বিশালতা অনুধাবন করা।

কী কী দরকার: কাগজ ও কলম।

যা করতে হবে:

১. একটি নীল রঙের কাগজ নিই। একটি কাগজে লিখি ছায়াপথ

২. মিল্কিওয়ে ছায়াপথ লেখা কাগজে বল পয়েন্ট কলম দিয়ে ছোটো একটি বিন্দু আঁকি এবং এর নাম দিই নক্ষত্র (সূর্য)।

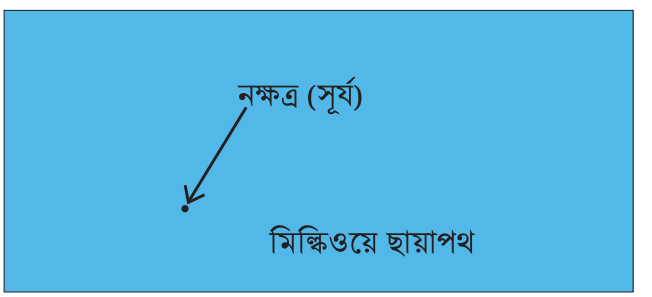

৩. ছায়াপথের বিশালতা সম্পর্কে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করি।

কাজ ২: ছায়াপথের তুলনায় মহাবিশ্বের বিশালতা অনুধাবন করা।

কী কী দরকার: কাগজ ও কলম।

যা করতে হবে:

১. একটি সাদা কাগজ নেই। কাগজের নিচের দিকে লিখি মহাবিশ্ব

২. মহাবিশ্ব লেখা কাগজের ওপরের দিকে বল পয়েন্ট কলম দিয়ে একটি বিন্দু আঁকি এবং এর নাম দিই মিল্কিওয়ে ছায়াপথ।

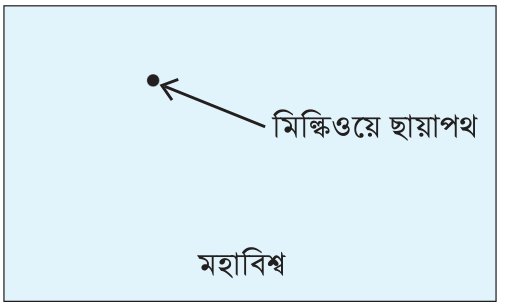

৩. মহাবিশ্বের বিশালতা সম্পর্কে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে আরও কয়েকটি উদাহরণ নিচের ছকে লিখি।

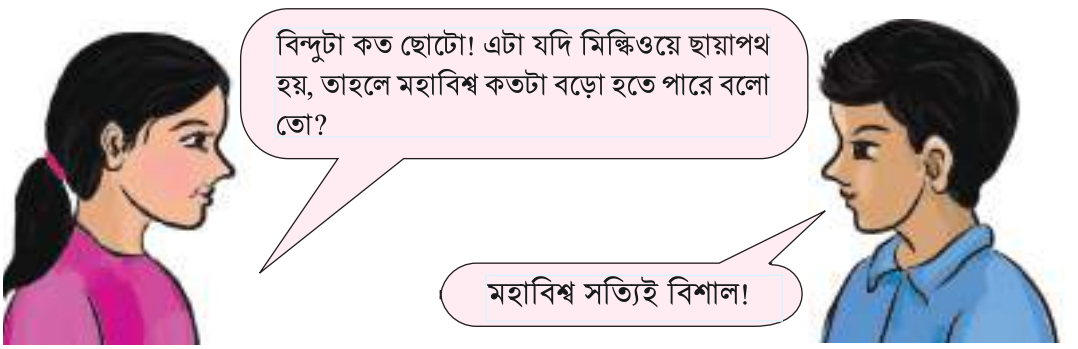

সারসংক্ষেপ

আমাদের সৌরজগতের একমাত্র নক্ষত্র সূর্য মিল্কিওয়ে নামক ছায়াপথের একটি ক্ষুদ্র অংশ, যা কাগজের ছোটো বিন্দুটি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে (কাজ-১)। মিল্কিওয়ে ছায়াপথ আবার মহাবিশ্বের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ, যা কাগজের ছোটো বিন্দুটি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে (কাজ-২)। এই দুটো কাজের মাধ্যমে আমরা মহাবিশ্বের বিশালতা সম্পর্কে জানতে পারলাম।

মহাবিশ্ব সম্পর্কে আরও কিছু জানি ...

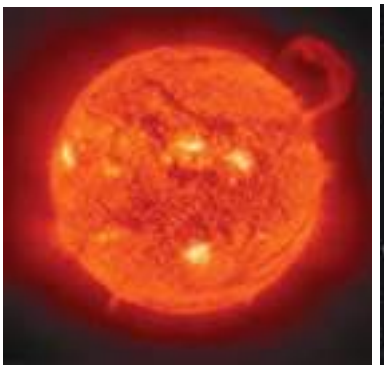

সূর্য একটি নক্ষত্র

নক্ষত্রমণ্ডল

হ্যালির ধূমকেতু

নক্ষত্রমণ্ডল: নক্ষত্রগুলো জোট বেঁধে অবস্থান করে। রাতের আকাশে নক্ষত্রের এই জোট কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর ন্যায় বিশেষ আকৃতির সৃষ্টি করে। বিশেষ আকৃতিসম্পন্ন নক্ষত্রের এই জোটকে নক্ষত্রমণ্ডল বলে। কালপুরুষ এমনই একটি নক্ষত্রমণ্ডল।

ছায়াপথ: একটি ছায়াপথে অনেক নক্ষত্র থাকে। মিল্কিওয়ে ছায়াপথ দেখতে সাপের মত আঁকাবাঁকা। রাতে আমরা যেসব নক্ষত্র এবং গ্রহ দেখতে পাই সেগুলো এই ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত। সূর্য মিল্কিওয়ে ছায়াপথের কেন্দ্রের চারপাশে আবর্তিত হয়।

ধূমকেতু: ধূমকেতু হলো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরা সৌরজগতের ছোটো বস্তু, যা বরফ, ধূলিকণা এবং পাথর দ্বারা গঠিত। এটি যখন সূর্যের কাছাকাছি আসে, তখন এর বরফ এবং অন্যান্য উদ্বায়ী পদার্থ গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। ফলে এর একটি মাথা এবং একটি দীর্ঘ লেজ সৃষ্টি হয়। হ্যালির ধূমকেতু সবচেয়ে বিখ্যাত ধূমকেতু। এটি প্রতি ৭৬ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী থেকে আবার এই ধূমকেতু দেখা যাবে ২০৬১ সালে!

গ্রহাণু: গ্রহাণু হলো এমন এক ধরনের বস্তু যা প্রধানত পাথরের তৈরি। এরা সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে। সৌরজগতে বেশিরভাগ গ্রহাণুই মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝে অবস্থান করে। কিছু কিছু গ্রহাণুর চাঁদের মতো উপগ্রহ রয়েছে।

মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী?

কাজ: মহাবিশ্ব এবং এতে থাকা বিভিন্ন বস্তু ছোটো থেকে বড়ো ক্রমানুসারে সাজানো।

যা করতে হবে:

নিচের নামগুলোর কোনটি আকারে বড়ো এবং কোনটি আকারে ছোটো বস্তু বোঝায় তা চিন্তা করি।

ছায়াপথ | নক্ষত্রমণ্ডল | উপগ্রহ | সূর্য

মহাবিশ্ব | ধূমকেতু | গ্রহ

নিচের উল্টা পিরামিডের ভেতর নামগুলো এমনভাবে সাজাই যেন সবচেয়ে বড়ো বস্তু উপরে থাকে।

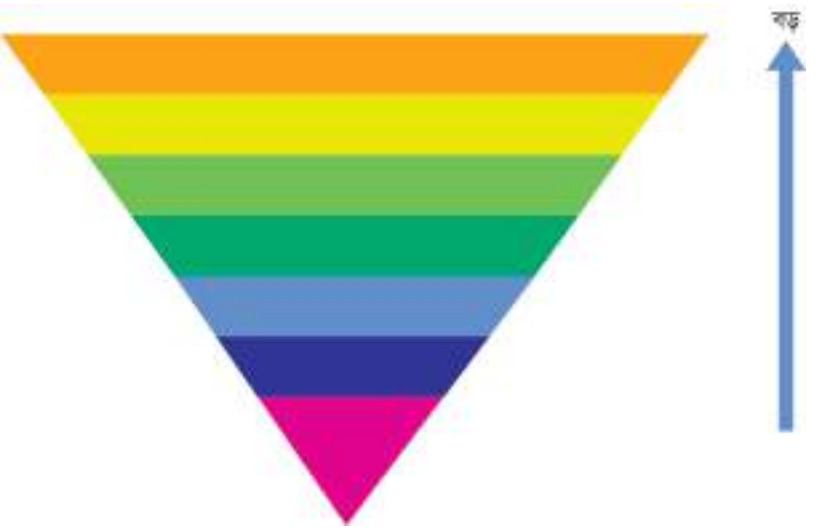

সারসংক্ষেপ

মহাবিশ্ব সত্যিই বিশাল এবং এতে অগণিত ছায়াপথ রয়েছে। প্রতিটি ছায়াপথে অসংখ্য নক্ষত্র রয়েছে। একটি নক্ষত্রমণ্ডল অনেক নক্ষত্রের সমষ্টি। সূর্য একটি নক্ষত্র, যা গ্রহগুলোর তুলনায় অনেক বড়ো। সৌরজগতের আটটি গ্রহের মধ্যে ছয়টির উপগ্রহ রয়েছে। উপগ্রহগুলো গ্রহের তুলনায় ছোটো। ধূমকেতু গ্রহ থেকেও ছোটো হয়।

৪. দৈনন্দিন জীবন-যাপনে মহাকাশের বস্তুসমূহের প্রভাব

সূর্য অস্ত গেলে চাঁদ ও তারা রাতের আকাশকে সুশোভিত এবং আলোকিত করে। রাতের আকাশে আমরা কেবল সৌরজগতের কাছে থাকা নক্ষত্রগুলো দেখতে পাই। দূরের নক্ষত্রগুলো রাতের আকাশে দেখা যায় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মহাকাশের বস্তুগুলোর মধ্যে মূলত চাঁদ ও সূর্যের প্রভাব লক্ষণীয়। চাঁদের আলো আমাদের অন্ধকারে দেখতে সহায়তা করে। চাঁদ থাকায় সাগরে জোয়ার-ভাটা তৈরি হয়। সূর্য আমাদের পৃথিবীতে আলো ও তাপের একমাত্র উৎস, যা জীবনের জন্য অপরিহার্য।

মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তু না থাকলে কী হতো?

কাজ: চাঁদ এবং সূর্য না থাকলে কী হতো তা বোঝা।

যা করতে হবে:

কয়েকটি দল গঠন করি এবং নিচের ছকটি পূরণ করি।

চাঁদ না থাকলে পৃথিবীর কী হতো?	সূর্য না থাকলে পৃথিবীর কী হতো?

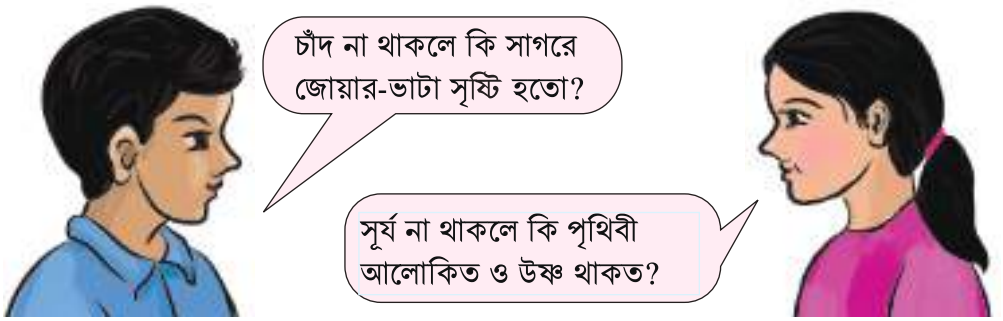

দৈনন্দিন জীবন-যাপনে মহাকাশের বস্তুসমূহের প্রভাব সম্পর্কে আরও কিছু জানি ...

পৃথিবীর উপর চাঁদের আকর্ষণের কারণে সাগরে জোয়ার-ভাটা সৃষ্টি হয়। সামুদ্রিক জলজ প্রাণীর বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় জোয়ার-ভাটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর অক্ষকে স্থিতিশীল রাখে। ফলে পৃথিবীতে ঋতুচক্র ও জলবায়ুর পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটে। তাই বলা যায়, পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে চাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

পৃথিবীর অক্ষের হেলানো অবস্থানের কারণে এর বিভিন্ন অংশে সূর্যের আলো ভিন্ন ভিন্নভাবে পৌঁছে। সূর্যের আলো ও তাপের পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তিত হয়। সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর সম্পূর্ণ একবার আবর্তন করার সময় হলো এক বছর বা প্রায় ৩৬৫ দিন। কৃষি কাজ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং ধর্মীয় উৎসবের জন্য বছরের সময়সূচি গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক(√)) চিহ্ন দিই।

১. চাঁদের নিজস্ব আলো নেই, কারণ–

ক) এটি সূর্যের আলো শোষণ করে
খ) এটি অন্ধকার বস্তু
গ) এটি সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে
ঘ) এটি পৃথিবীর আলোতে জ্বলে

২. পূর্ণিমায় কী ঘটে?

ক) পৃথিবী থাকে সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে
খ) চাঁদ থাকে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে
গ) পৃথিবী থাকে চাঁদ থেকে তুলনামূলক নিকট স্থানে
ঘ) পৃথিবী থাকে সূর্য থেকে তুলনামূলক নিকট স্থানে

৩. কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহৃত হয়–

ক) সূর্য পর্যবেক্ষণে
খ) যোগাযোগ ও আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে
গ) চাঁদের আলো বাড়াতে
ঘ) মহাকাশে আলো ছড়াতে

২। শূন্যস্থান পূরণ করি

১. ______ গ্রহকে সন্ধ্যাতারা ও শুকতারা বলা হয়।
২. সৌরজগতের কেন্দ্রে রয়েছে ______।
৩. চান্দ্রমাসে চাঁদ ______ দিনে তার পুরানো অবস্থানে ফিরে আসে

৩। বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল করি।

বাম	ডান
মঙ্গল গ্রহ	লাল গ্রহ বলা হয়
বুধ গ্রহ	সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ
শুক্র গ্রহ	তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি
পৃথিবী	এর পরিবেশ জীবদের বসবাসের উপযোগী
নেপচুন	সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরের গ্রহ

৪। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক) সৌরজগতের কয়টি গ্রহ রয়েছে? কী কী?

খ) পৃথিবীর উপযোগী পরিবেশ কী কী কারণে তৈরি হয়েছে?

গ) চাঁদ কীভাবে আলোকিত হয়?

ঘ) ইউরেনাস গ্রহকে নীল এবং মঙ্গল গ্রহকে লাল গ্রহ বলা হয় কেন?

৫। বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক) অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের অবস্থান ব্যাখ্যা করো।

খ) চাঁদের উচ্চভূমি এবং সমতল ভূমি কীভাবে প্রতিফলিত আলোর তারতম্য তৈরি করে?

গ) দৈনন্দিন জীবন-যাপনে মহাকাশের বস্তুসমূহের প্রভাব কীভাবে পড়ে তা ব্যাখ্যা করো।

অধ্যায় ৯

আবহাওয়া

দিনের শুরুতেই আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজের পরিকল্পনা করে থাকি। আমরা কী ধরনের পোশাক পরব, ছাতা প্রয়োজন কি না অথবা শীতের কাপড় নিতে হবে কি না তা কী দেখে ঠিক করি? এ কাজগুলোর বিষয়ে সাধারণত ঐ দিনের আবহাওয়া দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি।

১. আবহাওয়া

প্রকৃতিতে কখনো গরম, কখনো ঠান্ডা, কখনো অঝোর ধারায় বৃষ্টি আবার কখনো ঝড়ো হাওয়া দেখা যায়। কোনো স্থানে একটি দিনে প্রকৃতির এ অবস্থাগুলোকে আবহাওয়া বলা হয়।

আজকের দিনটি কেমন তা আমরা কীভাবে বুঝি?

রৌদ্রোজ্জ্বল দিন

বৃষ্টির দিন

শীতের দিন

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

কাজ: ছবি দেখে আবহাওয়া চিনি

যা করতে হবে:

উপরের ছবি থেকে ঐ দিনের আবহাওয়া কেমন ছিল তা পর্যবেক্ষণ করে নিচের ছকটি পূরণ করি-

ছবিতে আবহাওয়া কেমন		
১ নং ছবি	২ নং ছবি	৩ নং ছবি
• প্রখর সূর্যতাপ • পরিষ্কার আকাশ		

সারসংক্ষেপ

আবহাওয়া হলো নির্দিষ্ট স্থানে কোনো নির্দিষ্ট দিনের আকাশের অবস্থা, বায়ুর তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির সামগ্রিক প্রকাশ।

২. আবহাওয়ার প্রতীক

আমরা রেডিয়ো, টেলিভিশন ও খবরের কাগজ থেকে আবহাওয়ার খবর পেয়ে থাকি। এছাড়াও আমরা স্মার্টফোন বা কম্পিউটার থেকেও প্রতিদিনের আবহাওয়ার খবর জানতে পারি। আবহাওয়ার খবরে কী বলা হয়? এগুলো এরকম হতে পারে– 'দিনের তাপমাত্রা বাড়তে পারে' বা 'হাল্কা/ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে' বা 'হালকা কুয়াশা থাকতে পারে' অথবা 'দমকা বা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাবে'।

ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে আবহাওয়ার বিভিন্ন অবস্থা বোঝানো হয়। এবার সেগুলো দেখে চিনে নিই–

রৌদ্রোজ্জ্বল	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন	বর্ষণমুখর	বজ্রবৃষ্টি

প্রতীকের মাধ্যমে আমরা কীভাবে আবহাওয়ার অবস্থা শনাক্ত করব?

কাজ: আবহাওয়ার অবস্থা শনাক্তকরণ

যা করতে হবে:

নিচের ছকে দেওয়া প্রতীক ও তাপমাত্রা দেখে আবহাওয়ার অবস্থা শনাক্ত করে লিখি।

কাজটি নিয়ে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করি।

প্রতীক	তাপমাত্রা	আবহাওয়ার বর্ণনা
		• আকাশ আংশিক মেঘাচ্ছন্ন। • দিনে গরম অনুভূত হবে।

সারসংক্ষেপ

আমরা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে আবহাওয়ার **পূর্বাভাস** পেয়ে থাকি। এই পূর্বাভাস জানাতে আবহাওয়া অফিস বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করে।

৩. আবহাওয়ার উপাদান

আবহাওয়ার উপাদান বলতে আমরা বুঝি আমাদের চারপাশের কোন কোন বিষয়গুলো আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে। এই উপাদানগুলো হলো প্রধাণত তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, বায়ুর চাপ, মেঘের অবস্থান ইত্যাদি। এই উপাদানগুলোর মধ্যে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত নিয়ে আলোচনা করব। আবহাওয়ার উপাদানগুলোর বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী আবহাওয়া কেমন হবে তা জানা যায়।

আবহাওয়ার উপাদানগুলো কী কী?

কাজ: আবহাওয়ার উপাদান খুঁজে বের করি।

যা করতে হবে:

১। বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের সঠিক বাক্যাংশটি দাগ টেনে মিলাই।

ঘটনা	কেন ঘটে?
১। আমাদের গরম লাগে	আর্দ্রতা বাড়লে
২। আমরা ঘেমে যাই	তাপমাত্রার পার্থক্য হলে
৩। ঠোঁট ফেটে যায়	বর্ষাকালে
৪। ভেজা কাপড় দেরিতে শুকায়	তাপমাত্রা বাড়লে
৫। বায়ু প্রবাহিত হয়	শীতকালে

সারসংক্ষেপ

বায়ুর তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে আমরা ঠান্ডা বা গরম অনুভব করি। বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকলে শীতকালে আমাদের হাত, পা, ঠোঁটের চামড়া ফেটে যায়। আবার আর্দ্রতা বেড়ে গেলে আমরা ঘেমে যাই, বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বাড়ে। বায়ুপ্রবাহের গতি থেকে আমরা ঝড়ের পূর্বাভাস জানতে পারি।

আবহাওয়ার উপাদান সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

তাপমাত্রা

আমরা প্রতিদিন একই রকম ঠান্ডা বা গরম অনুভব করি না। বাতাস কতটা ঠান্ডা বা গরম তার ভিত্তিতেই আমাদের ঠান্ডা বা গরম লাগে। কোনো সময় বাতাস কতটা ঠান্ডা বা গরম, তাই ঐ সময়ের তাপমাত্রা।

একই দিনের সকালবেলা ঠান্ডা এবং দুপুরটা বেশ গরম হতে পারে। তোমরা কি জানো কেন এমন হয়ে থাকে? সকালবেলা সূর্য উঠলে তাপমাত্রা বেড়ে আবহাওয়া ধীরে ধীরে গরম হতে থাকে। আবার সন্ধ্যায় সূর্য যখন অস্ত যায় তখন তাপমাত্রা কমে পরিবেশ ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়। তাপমাত্রা যত বেশি হবে তত বেশি জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়। এই জলীয়বাষ্প পরবর্তী সময়ে প্রচুর মেঘ উৎপন্ন করে। তাপমাত্রা প্রকাশ করা হয় সেলসিয়াস (^0C) দিয়ে।

আর্দ্রতা

বাতাসে যখন জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে তখন সেটি বাতাসের শুষ্ক অবস্থা। যখন এর পরিমাণ বেশি থাকে তখন সেটি বাতাসের আর্দ্র অবস্থা। বাতাসের জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিই হলো আর্দ্রতা। বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকলে কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায়, আমাদের ঠোঁট ও চামড়া ফেটে যায়। আর্দ্রতার পরিমাপ শতকরা (%) হারে প্রকাশ করা হয়। সাধারণত আর্দ্রতা ৯০%- এর বেশি হলে বৃষ্টিপাত ঘটে।

বৃষ্টিপাত

জলীয় বাষ্প আকাশে মেঘ হয়ে ভেসে বেড়ায়। তাপমাত্রা ও বায়ু চাপের প্রভাবে ঠান্ডা হয়ে এই মেঘ বৃষ্টি হয়ে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। বৃষ্টি, তুষার, শিশির, শিলাবৃষ্টি সবকিছুই বৃষ্টিপাত হিসেবে গণ্য করা হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাপ মিলিমিটারে (mm) প্রকাশ করা হয়।

বায়ুপ্রবাহ

পতাকা বা গাছের পাতার নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারি যে বাতাস বইছে বা বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। আমরা বাতাস দেখতে পাই না। কিন্তু বাতাস বইলে তা বোঝা যায়। বায়ুপ্রবাহ হলো বায়ুর সচল অবস্থা। বায়ু কখনো ধীরে আবার কখনো তীব্র বেগে প্রবাহিত হয়। বায়ুপ্রবাহকে এর দিক ও গতি দ্বারা বিবেচনা করা যায়।

বাতাসে পতাকা উড়ছে

ঝড়ো বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে

৪. আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক

ইতোমধ্যেই আমরা আবহাওয়ার উপাদানগুলো কী তা জেনেছি। মূলত উপাদানগুলোর অবস্থার পরিবর্তন হলেই আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়।

? আবহাওয়ার উপাদানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক কী?

কাজ: আবহাওয়ার উপাদানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করি।

যা করতে হবে:

১। বামপাশের বাক্যের সাথে ডানপাশের সঠিক বাক্যটি দাগ টেনে মিলাই।

ঘটনা	কী ঘটে?
১। বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি	তাপমাত্রা কমে যায়
২। আর্দ্রতা বৃদ্ধি	মেঘ তৈরি হয়
৩। বায়ু প্রবাহ বৃদ্ধি	বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা
৪। বৃষ্টিপাত হলে	ঝড়ের সম্ভাবনা

সারসংক্ষেপ

আবহাওয়ার উপাদানগুলো পরস্পর নির্ভরশীল। একটি উপাদানের হ্রাস-বৃদ্ধি হলে অন্য উপাদানের উপর তার প্রভাব পড়ে। আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই সামগ্রিক আবহাওয়া বোঝা যায়।

আবহাওয়ার উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে আরও কিছু জানি...

তাপমাত্রার প্রভাবে বাতাসে আর্দ্রতা কম-বেশি হয়। আবার যখন ভূপৃষ্ঠের কোনো অঞ্চল অন্য অঞ্চল থেকে বেশি গরম হয় তখন সে স্থানের বায়ু হাল্কা হয়ে উপরে উঠে যায়। ফলে সেখানে বায়ুশূন্যতা সৃষ্টি হয় ও বায়ুর চাপ কমে যায়। আশপাশের এলাকার বায়ু দ্রুতবেগে ঐ শূন্যতা পূরণ করে। এভাবে তাপমাত্রার পার্থক্যের ফলে বায়ু প্রবাহিত হয়। তাপমাত্রার প্রভাবে বায়ুপ্রবাহের দিকও পরিবর্তন হয়। যেমন দিনের বেলায় সমুদ্রের বাতাস অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে। সমুদ্র থেকে এই শীতল বাতাস স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। এতে স্থলভাগ শীতল হয়। রাতের বেলায় স্থলভাগের বাতাস শীতল থাকে। এই শীতল বাতাস সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় এবং সমুদ্রের গরম বাতাস স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে রাতে গরম অনুভূত হয়। মাঝে মাঝে বায়ুপ্রবাহ অনেক শক্তিশালী হয়ে ঝড় বা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করে। বায়ুপ্রবাহ জলীয়বাষ্পকে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় বয়ে নিয়ে যায়। তাই বায়ুপ্রবাহ কখনো বৃষ্টিপাত ঘটায় অথবা মেঘ সরিয়ে আকাশ পরিষ্কার করে। আর্দ্রতা বেশি হলে সহজেই মেঘ থেকে বৃষ্টি অথবা শিশির তৈরি করে।

তাপমাত্রা যত বাড়ে নদ-নদী, সমুদ্র, খাল-বিল এবং হ্রদ থেকে তত বেশি পানি জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। এই জলীয় বাষ্পই মেঘ হয় ও পরবর্তী সময়ে বৃষ্টি হয়ে নামে। তাই তাপমাত্রা বাড়লে বৃষ্টিপাত বাড়ে।

দিনের বেলা সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় বায়ুপ্রবাহ

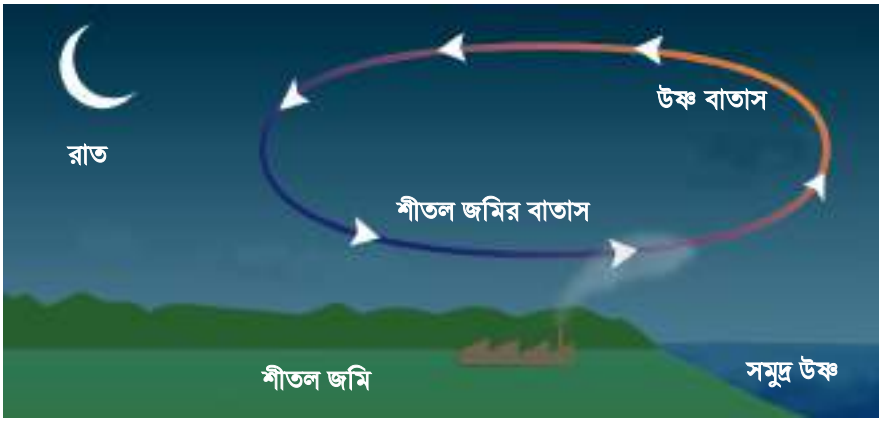

রাতের বেলা সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় বায়ুপ্রবাহ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

৫. আবহাওয়ার প্রভাব, পরিবর্তন, তথ্য বিশ্লেষণ ও সতর্কতা

আমরা আবহাওয়ার উপাদানগুলো সম্পর্কে জেনেছি। আবহাওয়ার এ উপাদানগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

আবহাওয়া সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে হলে বা কোনো নির্দিষ্ট দিনের আবহাওয়া কেমন হবে তা বের করতে হলে ঐ দিনের বা আগের দিনের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুর চাপ ইত্যাদির তথ্য জানতে হবে। কোনো দিনের আবহাওয়ার তথ্য জানার জন্য সাধারণত টেলিভিশন, ইন্টারনেট, মোবাইল, খবরের কাগজ ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে হয়।

আবহাওয়া অনুযায়ী দৈনন্দিন জীবনে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করব?

কাজ:আবহাওয়ার তথ্য বিশ্লেষণ, পূর্ভাবাস ও সতর্কতা

যা করতে হবে:

দলে বিভক্ত হয়ে ছকটি পূরণ করি এবং অন্যান্য দলের সাথে মিলিয়ে দেখি।

আবহাওয়ার উপাদান	আবহাওয়ার তথ্য	আবহাওয়ার পূর্বাভাস	সতর্কতামূলক ব্যবস্থা
১. তাপমাত্রা ২. আর্দ্রতা ৩. বায়ুপ্রবাহ	২৫° সেলসিয়াস ৯০% দমকা হাওয়া	ঝড় ও বৃষ্টির সম্ভাবনা	ছাতা ব্যবহার
১. তাপমাত্রা ২. আর্দ্রতা ৩. বায়ুপ্রবাহ	৪০° সেলসিয়াস ৩০% মৃদু হাওয়া		
১. তাপমাত্রা ২. আর্দ্রতা ৩. বায়ুপ্রবাহ	১২° সেলসিয়াস ৫০% শীতল হাওয়া		

কাজ: সময় ও তাপমাত্রার পরিবর্তনের লেখচিত্র অঙ্কন

যা করতে হবে:

নিচে ছকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আনুভূমিক বরাবর সময় এবং উলম্ব বরাবর তাপমাত্রা বসিয়ে সময়-তাপমাত্রা লেখচিত্র অঙ্কন করি।

সময়	সকাল					দুপুর			বিকাল			সন্ধ্যা
সময়	৭	৮	৯	১০	১১	১২	০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেলসিয়াস)	২৫°	২৬°	২৬°	২৯°	৩০°	৩১°	৩১°	৩১°	৩১°	৩০°	২৯°	২৭°

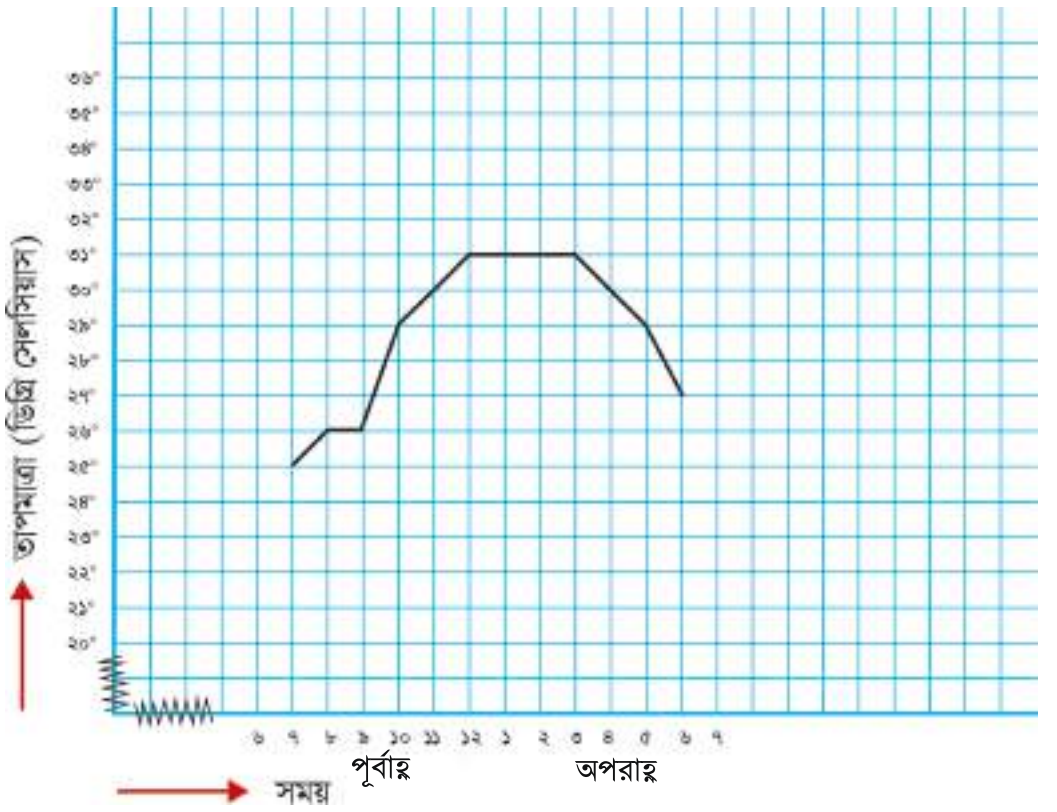

সময় ও তাপমাত্রার লেখচিত্র (নমুনা)

মেঘ দেখে পূর্ভাবাস

মেঘ হলো আকাশে ভাসমান পানির কণা। এরা সাদা/ধূসর/কালো তুলার মতো বস্তু যা আকাশে ভেসে বেড়ায়। মেঘের উচ্চতা ও গঠনের উপর ভিত্তি করে মেঘের শ্রেণিকরণ করা হয়। মেঘকে দশটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রাথমিকভাবে আমরা চার ধরনের মেঘ নিয়ে আলোচনা করব।

বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চার ধরনের মেঘ–

- সাদা তুলা বা পালকের মতো আকাশের অনেক উপরের দিকে ভেসে থাকে তাকে সাইরাস মেঘ (Cyrus) বলে। এই মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হয় না।
- ধূসর বা সাদা স্তুপ আকৃতির মেঘ যা দেখতে ফুল কপির মতো। এই মেঘের নাম কিউমুলাস (Cumulus)। এই মেঘে বজ্রপাতসহ বৃষ্টিপাত হতে পারে।
- পাতলা পর্দার মতো ধূসর রঙের মেঘ পুরো আকাশ ছেয়ে থাকে। এই মেঘকে বলে স্ট্রেটাস (Stratus)। এই মেঘ থেকে কখনো হালকা বৃষ্টি হতে পারে।
- ধূসর বা কালো মেঘ যা পৃথিবীর খুব কাছাকাছি থাকে, তা হলো **নিম্বাস** (Nimbus)। এই মেঘের কারণে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

সাইরাস মেঘ

কিউমুলাস মেঘ

স্ট্রেটাস মেঘ

নিম্বাস মেঘ

সারসংক্ষেপ

আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়া দেখতে পাই। বিভিন্ন কারণে আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়। মূলত আবহাওয়ার উপাদানগুলোর পরিবর্তনেই এটি হয়। আবহাওয়ার পূর্বাভাস শুনে ও দেখে আমরা সর্তকতামূলক ব্যবস্থা নিতে পারি। অনেক সময় আকাশে মেঘ দেখে বৃষ্টির পূর্ভাবাস পাওয়া যায়।

আমাদের জীবনে আবহাওয়ার প্রভাব:

আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে আমরা নিরাপদে থাকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারি। আবহাওয়া যখন **বিরূপ** হয়, তখন আবহাওয়া অফিস কয়েক ধরনের বিপদ সংকেত দিয়ে থাকে। সেগুলো বুঝে, মেনে চললে আমরা আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারি। ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে উপকূলীয় মানুষদেরকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়। অতিবৃষ্টির কারণে আমাদের নানা রকমের ক্ষতি হয়। পাহাড়ি অঞ্চলে অতিবৃষ্টির পূর্বাভাস জেনে ঐ এলাকার মানুষদের সরিয়ে নেওয়া হয়। এতে পাহাড় ধসের মতো দুর্ঘটনার হাত থেকে মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া যায়। এ পূর্বাভাস অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ওষুধ, সরঞ্জামাদি সাথে রাখার ব্যবস্থা করতে পারলেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমে যায়।

৬. আবহাওয়ার সাথে পানির বিভিন্ন অবস্থার সম্পর্ক

আবহাওয়ার সাথে পানির বিভিন্ন অবস্থার সম্পর্ক রয়েছে। পানির বিভিন্ন অবস্থা হলো মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা, শিশির।

মেঘ

? মেঘ কীভাবে তৈরি হয়?

তোমরা কি কখনো আকাশ দেখে বৃষ্টি হবে কিনা বুঝতে পারো? বাড়ির বড়োরা তা পারেন। যেমন- আকাশে ঘন ও কালো মেঘ দেখলে বোঝা যায় বৃষ্টি হতে পারে। এবার বলো তো, মেঘ কী?

ভূপৃষ্ঠের পানি সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়। উপরের ঠান্ডায় এই বাষ্প ছোটো ছোটো পানি-কণায় পরিণত হয়ে ভেসে বেড়ায়। এগুলোই মেঘ। এই ছোটো ছোটো কণাগুলো একত্রিত হয়ে বড়ো কণায় পরিণত হলে, বৃষ্টি হয়ে নিচে নেমে আসে।

মেঘ কীভাবে সৃষ্টি হয় তা খেলার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করি।

মেঘ তৈরির খেলা

কাজ: মেঘ তৈরির মজার খেলা

যা লাগবে: একটি পরিষ্কার প্লাস্টিক বোতল, গরম পানি, দিয়াশলাই।

যা করতে হবে:

১. একটি পরিষ্কার প্লাস্টিকের বোতল নিই।
২. বোতলের মধ্যে সাবধানে সামান্য পরিমাণে গরম পানি প্রবেশ করাই।
৩. ছিপি বন্ধ করে বোতলটি ঝাঁকাই, যাতে পানির কণাগুলো বোতলের গায়ে লেগে যায়।
৪. অতিরিক্ত পানি ফেলে দিই।
৫. বোতলে মেঘ তৈরির প্রথম উপাদান পানি রয়েছে।
৬. শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সেটিকে নিভিয়ে ফেলি। নেভানো কাঠিটিকে দ্রুত বোতলের ভিতর ঢুকিয়ে ছিপি বন্ধ করে দিই। বোতলটিকে সামনে পিছনে কয়েকবার ঝাঁকাই। বোতলের ভিতর ধোঁয়ার মতো বাষ্প তৈরি হলো। বাষ্প মেঘ তৈরির দ্বিতীয় উপাদান হিসেবে কাজ করে।
৭. দুই হাতের সাহায্যে বোতলটির মাঝ বরাবর যত জোরে সম্ভব চাপ দিই ও সরিয়ে নিই। কাজটি খুব দ্রুত করি। মেঘ তৈরির তৃতীয় উপাদান চাপ ও তাপমাত্রার পরিবর্তন তৈরি হলো।
৮. কয়েকবার চাপ দেওয়া ও সরিয়ে নেওয়ার পর বোতলের মধ্যে মেঘ দেখতে পেলাম।

প্রকৃতিতে রৌদ্রের তাপে সাগর ও নদীর পানি বাষ্পীভূত হয়ে জলীয়বাষ্পে পরিণত হয়। যখন বাতাসের জলীয়বাষ্প ঠান্ডা হয় তখন তা সূক্ষ্ম ধূলিকণার উপর জমা হয়ে ক্ষুদ্র জল-কণা তৈরি করে। এই ক্ষুদ্র জল-কণা আকাশে মেঘ হিসেবে ভেসে বেড়ায়।

বৃষ্টি

আকাশে মেঘের ফোঁটাগুলো যথেষ্ট ভারী হলে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে। এটাই বৃষ্টি। বিশ্বের বেশিরভাগ অঞ্চলেই সুপেয় পানির প্রধান উৎস বৃষ্টি।

? বৃষ্টি কীভাবে হয়?

কাজ: জলীয় বাষ্প থেকে পানি তৈরি করি

যা যা প্রয়োজন: স্বচ্ছ কাচের গ্লাস, গরম পানি, কয়েক টুকরা বরফ, একটি স্টিলের প্লেট।

যা করতে হবে:

কাচের গ্লাসের মধ্যে সাবধানে গরম পানি নিই।

১। গ্লাসটি স্টিলের প্লেট দিয়ে ঢেকে দিই।

২। স্টিলের প্লেটের উপর কয়েক টুকরা বরফ রাখি।

৩। প্লেটের তলার দিকে লক্ষ করি।

দেখা যাচ্ছে–

প্লেটের তলায় বিন্দু বিন্দু পানির ফোঁটা জমেছে। এই পানির ফোঁটা কোথা থেকে এলো?

জলীয় বাষ্প থেকে পানি তৈরির পরীক্ষা

এখানে গ্লাসের গরম পানি থেকে তৈরি হওয়া জলীয়বাষ্প অপেক্ষাকৃত শীতল প্লেটের সংস্পর্শে এসে পানির কণায় পরিণত হয়েছে। এটিই প্লেটের তলায় বিন্দু বিন্দু পানির ফোঁটা আকারে জমেছে। বিন্দু বিন্দু পানির ফোঁটাগুলো বড়ো হলে এক সময় নিচে পড়ে যায়। তোমাদের বাড়িতেও ভাত রান্নার সময় পাতিলের ঢাকনার নিচে লক্ষ করলে দেখবে যে ছোটো ছোটো পানির ফোঁটা জমা হয়েছে।

একইভাবে বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প উপরে ঠান্ডার সংস্পর্শে এসে মেঘ তৈরি করে। মেঘের ছোটো ছোটো জল-কণাগুলো মিলে বড়ো জলের কণা তৈরি হয়। বড়ো জল-কণাগুলো ভারী, তাই বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে না। ফোঁটা ফোঁটা পানি হয়ে নিচে নেমে আসে। এটিই বৃষ্টি। তোমরা লক্ষ করে থাকবে, অনেক সময় বৃষ্টির সাথে বরফের টুকরো পড়ে। তোমরা কি জানো এগুলো কী? এগুলো হলো শিলা। যা জমাটবদ্ধ পানির কণাসমূহ থেকে তৈরি হয়।

কুয়াশা ও শিশির

? কুয়াশা ও শিশির আসে কোথা থেকে?

কুয়াশা শব্দটির সাথে আমরা সকলেই কম বেশি পরিচিত। সাধারণত শীতকালে কুয়াশা দেখা যায়। কুয়াশা এক ধরনের মেঘ, যা আমরা ভূপৃষ্ঠে দেখে থাকি। বাতাসের জলীয়বাষ্প ভাসমান ধূলিকণার চারদিকে অতি ক্ষুদ্র পানির কণার আকারে জমা হয়ে মেঘে পরিণত হয়। এই মেঘ ভূপৃষ্ঠের নিকটে ধোঁয়ার আকারে ভাসতে থাকে, এটিই কুয়াশা। কুয়াশা আবার গাছের পাতা বা ঘাসের উপর জমা হয়ে আবারও ক্ষুদ্র জল-কণা হয়ে যায়, এটি শিশির।

ঘাসের উপর শিশির বিন্দু

সারসংক্ষেপ

মেঘ পরিবেশ ও আবহাওয়ার জন্য অপরিহার্য। মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় যা জীবনধারণের জন্য খুবই দরকার। পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদনের জন্য বৃষ্টির ভূমিকা অপরিসীম। আবার বেশি বৃষ্টি হলে বন্যা দেখা দেয়, যার ফলে ফসল ও ঘরবাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয়। কুয়াশার কারণে অল্প দূরের কোনো কিছু দেখতে অসুবিধা হয়। ফলস্বরূপ যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন বা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। গরম আবহাওয়ায় কুয়াশা দিনের তাপমাত্রা কমাতে সাহায্য করে। কুয়াশার কারণে ফসলেরও ক্ষতি হয়। শিশির গাছের পানি সরবরাহ করে। বাতাসের আর্দ্রতা বৃদ্ধি করে। এটি জীব জগতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৭. পানিচক্র

পানির আরেক নাম জীবন। পানি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু এই পানি সর্বদা একই অবস্থায় থাকে না। প্রকৃতিতে একে আমরা বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হতে দেখি।

আজ আমরা একটি মজার বিষয় শিখব। একটি বোতলের পানি থেকে সামান্য পরিমাণ পানি টেবিলের উপর ঢেলে দিই। কিছুক্ষণ পর লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাব, এই পানি শুকিয়ে গেছে। আমরা কি জানি পানি শুকিয়ে কোথায় গেল? বাড়িতে আমরা এরকম আর কী কী শুকাতে দেখি? তোমরা কি কখনো শিলাবৃষ্টি দেখেছ? শিলাগুলো মূলত বরফের টুকরা। একটি পাত্রে কয়েকটি শিলার টুকরা কিছুক্ষণ রেখে দিলে আমরা কী দেখতে পাই?

কয়েকটি শিলা

শিলার পানিতে পরিবর্তন

বর্ষাকালে বৃষ্টির এত পানি কোথা থেকে আসে? নদী-নালা, খাল-বিল, হ্রদ এবং সাগরের এত পানি কীভাবে, কোথা থেকে আসে আর কোথায়ই-বা যায়?

সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে নিচের ছকে উত্তরগুলো লিখি।

রান্নার পর হাঁড়ির ঢাকনার নিচে আমরা কী দেখতে পাই?	
ভেজা কাপড় রোদে ছড়িয়ে দিলে কী ঘটে?	
শিলাবৃষ্টির বরফ টুকরাগুলো মাটিতে পড়লে কিছুক্ষণ পরে কী হয়?	
গরমকালে খাল, বিল ও পুকুরের পানি কেন কমে যায়?	
বর্ষাকালে বৃষ্টির এত পানি কোথা থেকে আসে?	

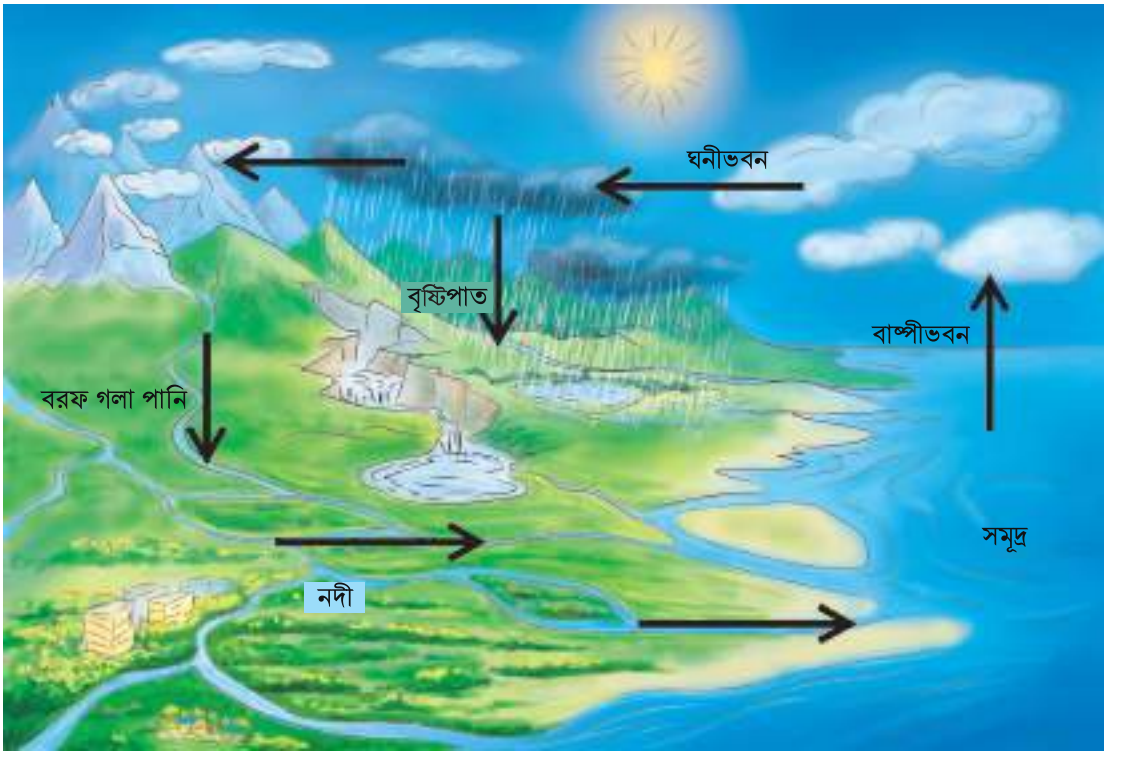

পানিচক্র

উপরের প্রশ্নের উত্তরগুলো থেকে দেখা যায় যে, পানি এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হচ্ছে। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানি বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে ভূপৃষ্ঠ এবং বায়ুমণ্ডলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তাই হচ্ছে পানিচক্র।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

সাগর, নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের পানি সূর্যের তাপে বাষ্পীভূত হয়ে জলীয়বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পীভূত পানি উপরে উঠে ঠান্ডা ও ঘনীভূত হয়ে পানির বিন্দুতে পরিণত হয়। এগুলো পরবর্তীকালে একত্রিত হয়ে মেঘ তৈরি করে। মেঘের এই কণাগুলো বড়ো হয়ে বৃষ্টি হিসেবে আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে এবং নদী-নালা, খাল-বিল এবং হ্রদে জমা হয়। এসব উৎস থেকে পানি বিভিন্নভাবে সমুদ্রে এসে পড়ে। সমুদ্রের পানি বাষ্পীভূত হয়ে আবার বায়ুতে ফিরে যায়। এভাবেই পানিচক্র চলতে থাকে। এই চক্রের মাধ্যমেই সর্বত্র পানির অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। পানিচক্রের কারণেই পৃথিবীতে পানির ভারসাম্য বজায় থাকে।

পানিচক্রে তাপের ভূমিকা

উঁচু পর্বতের চূড়ায় অনেক বরফ জমে থাকে। সেগুলো তাপে গলে জলপ্রপাত বা ঝরনা হয়। সেই ঝরনার পানি গড়িয়ে গড়িয়ে নদী হয়ে সাগরে মিশে যায়। নদী হতে সাগরে যাওয়ার সময় কিছু পানি খাল বিলেও যায়। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকে। তাই সাগর, নদী, খাল, বিলের কিছু পানি বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যায়। তখন খাল-বিল, নদী-নালার পানি কিছুটা কমে যায়।

ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠা যায় তাপমাত্রা তত কমতে থাকে। এই বাষ্পগুলো আকাশের উপরের স্তরে পৌঁছালে কম তাপমাত্রার কারণে ছোটো ছোটো পানির কণায় পরিণত হয়। এই ছোটো ছোটো পানির কণাই মেঘ। এই মেঘ বায়ুপ্রবাহের কারণে ভেসে বেড়ায়। বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে বাতাসে মেঘগুলো ভেসে ভেসে একদিক থেকে অন্যদিকে উড়ে যায়। আরও উপরের মেঘগুলো ঠান্ডা হয়ে বড়ো বড়ো পানির কণায় পরিণত হয়। এগুলোই বৃষ্টি আকারে মাটিতে পড়ে। নদী, সমুদ্র, পুকুর, খাল ও বিলের পানি এভাবেই বাষ্প থেকে আবার পানি হয়ে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। কিছু বাষ্প উড়ে অনেক উঁচুতে পৌঁছায়। সেখানে তাপমাত্রা অনেক কম। ফলে মেঘের কণাগুলো ভারী হয়ে তুষারে পরিণত হয়। এই তুষার নিচে নেমে এসে পাহাড়ের চূড়ায় বরফ আকারে জমা হয়। এই ঘটনাগুলো অবিরাম চলতে থাকে।

সারসংক্ষেপ

তাপ প্রয়োগের ফলে পানি বাষ্পে পরিণত হয়, একে বাষ্পীভবন বলা হয়। বাষ্প যখন ঠান্ডা হয়ে তরল পানিতে পরিণত হয় তখন সেটি হলো ঘনীভবন। প্রকৃতিতে এই দুটি ঘটনা সব সময় চলতে থাকে। এর ফলেই পানিচক্র সংঘটিত হয়। পানিচক্রের ফলে এক জায়গার পানি অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিই।

ক. নিচের কোনটি আবহাওয়ার উপাদান নয়?

১) তাপমাত্রা ২) আর্দ্রতা

৩) বায়ুপ্রবাহ ৪) পূর্ণিমা

খ. কোনো পদার্থ তরল থেকে বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?

১) বাষ্পীভবন ২) ঘনীভবন

৩) বাষ্পীকরণ ৪) তরলীকরণ

গ. পানিকে তাপ দিলে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। এখানে কি ঘটে?

১) বাষ্পীভবন ২) ঘণীভবন

৩) বাষ্পীকরণ ৪) তাপশোষণ

২। শূণ্যস্থান পূরণ করি।

ক. সাদা পালকের মতো মেঘগুলোকে বলে ---------- মেঘ।

খ. বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা----------।

গ. কুয়াশা গাছের পাতার সংস্পর্শে এসে -------- এ পরিণত হয়।

৩। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক. আবহাওয়ার উপাদানগুলো কী কী?

খ. বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকলে কী হয়?

গ. কোন ধরনের মেঘে অনেক বৃষ্টিপাত হয়?

৪। বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক. আবহাওয়া বলতে কি বুঝায়? আবহাওয়ার তথ্য আমরা কীভাবে পেয়ে থাকি?

খ. বৃষ্টি কীভাবে হয়?

গ. কৃষিক্ষেত্রে আবহাওয়ার গুরুত্ব কী?

অধ্যায় ১০

তথ্য ও প্রযুক্তি

আমাদের জীবনে তথ্য ও প্রযুক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য ব্যবহার করে আমরা আমাদের জীবনধারায় পরিবর্তন আনি। তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য বিশ্লেষণ ও তথ্য বিনিময়ের জন্য বিভিন্ন যন্ত্র বা প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার– এসব কিছু নিয়েই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communication Technology)। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সংক্ষেপে আইসিটি (ICT) বলা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে আরও সহজ ও উন্নত করে।

১. তথ্য, তথ্যের উৎস ও তথ্যের ধরন

মনে করি, আমরা একজন দোকানদারের নিকট প্রতি ডজন ডিমের দাম জানতে চাইলাম। দোকানদার উত্তর দিলেন, প্রতি ডজন ডিমের দাম একশ বিশ টাকা। দোকানদারের এই উত্তর হচ্ছে একটি তথ্য। আর দোকানদার হলেন আমাদের নিকট তথ্যের উৎস। দোকানদার ছাড়াও এরকম আরও তথ্যের উৎস হতে পারে খবরের কাগজ, রেডিয়ো, টেলিভিশন ইত্যাদি। আমরা টেলিভিশনের খবর থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে পারি।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেসব তথ্য পেয়ে থাকি সেগুলো কি একই ধরনের? নিশ্চয়ই না। মনে করো, স্কুলের নোটিশ বোর্ড দেখে আমরা অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা শুরুর তারিখ জানতে পারলাম। এখানে তথ্য হচ্ছে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা শুরুর তারিখ, তথ্যের উৎস হচ্ছে স্কুলের নোটিশ বোর্ড আর তথ্যের ধরন হচ্ছে শিক্ষা বিষয়ক। তথ্যের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। যেমন: খেলাধুলাবিষয়ক তথ্য, ব্যবসা-বাণিজ্যবিষয়ক তথ্য, আবহাওয়াবিষয়ক তথ্য, শিক্ষাবিষয়ক তথ্য, স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য, অর্থনীতিবিষয়ক তথ্য ইত্যাদি।

আবার মনে করি, আমরা ইন্টারনেট থেকে আগামী ফুটবল বিশ্বকাপের সময়সূচি সম্পর্কে জানতে পারলাম। এখানে কোনটি তথ্য, কোনটি তথ্যের উৎস আর তথ্যের ধরনই– বা কী– বলতে পারবে?

তথ্যের উৎস ও ধরন কী?

কাজ: তথ্যের উৎস ও ধরন খুঁজে বের করা।

রেডিয়ো

টেলিভিশন

বই

ইন্টারনেট

যা করতে হবে–

১. আমরা দলে আলোচনা করে একটি বিষয়– সম্পর্কিত তথ্য, তথ্যের উৎস ও তথ্যের ধরন সম্পর্কে নিচের ছকটি পূরণ করি।

২. দলের একজন সদস্য শ্রেণিতে দলের কাজ উপস্থাপন করি।

৩. অন্য দলগুলো উপস্থাপন শেষে অন্যান্য বিষয়– সম্পর্কিত তথ্য, তথ্যের উৎস ও তথ্যের ধরন নিয়ে দলে আলোচনা করে ছকের বাকি অংশ পূরণ করি।

তথ্য	তথ্যের উৎস	তথ্যের ধরন
অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা শুরুর তারিখ	স্কুলের নোটিশ বোর্ড	শিক্ষাবিষয়ক

সারসংক্ষেপ

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং সরাসরি মানুষকে জিজ্ঞাসা করে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। শিক্ষক, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশী থেকে আমরা অনেক ধরনের তথ্য পেয়ে থাকি। তথ্যের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। যেমন- খবরের কাগজ, বই, রেডিয়ো, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদি।

তথ্যের উৎস ও ধরন সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

তথ্য আমাদের জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য জানার মাধ্যমে আমরা নতুন নতুন অনেক বিষয় শিখতে পারি বা সিদ্ধান্ত নিতে পারি। সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য জানা খুবই জরুরি। তথ্য সংগ্রহ করার উৎসটি নির্ভরযোগ্য হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য শুধু নিজে জানলেই হবে না, প্রয়োজনে অন্যদেরকেও জানাতে হবে। যেমন– আমি যদি পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের কথা জানতে পারি, তাহলে তা আমার সহপাঠীদেরকে জানাতে হবে। না জানালে সহপাঠীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আবার মনে করো, আবহাওয়াবিদগণ জানতে পারলেন যে, সাতদিন পরে প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস হবে। এই তথ্যটি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হলে সমুদ্র-উপকূলের অনেক মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা পাবে।

২. তথ্য সংগ্রহ

তথ্যের সঠিক ব্যবহার বলতে বোঝায় যথাযথভাবে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিময় করা।

যদি প্রশ্ন করা হয় 'আজকে আমাদের বিদ্যালয়ে মোট কতজন শিক্ষার্থী উপস্থিত আছে?'–আমরা কি সাথে সাথে উত্তর দিতে পারব? নিশ্চয়ই না। এই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য প্রথমে শ্রেণিশিক্ষকগণের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রতিটি শ্রেণিতে উপস্থিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা জেনে নিতে হবে। এরপর সবগুলো শ্রেণির তথ্য যোগ করলেই আমরা জানতে পারব যে, আজকে আমাদের বিদ্যালয়ে মোট কতজন শিক্ষার্থী উপস্থিত আছে। তথ্য জোগাড় করার এই কাজটিই হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ। আমরা নানা উপায়ে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকি।

আমরা কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করে থাকি?

কাজ: তথ্য সংগ্রহের উপায় শনাক্ত করা

যা করতে হবে:

১. দৈনন্দিন জীবনে আমরা কোন তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করি তা নিচের ছকে লিখি। (উদাহরণ হিসেবে একটি ঘরপূরণ করে দেওয়া আছে)

তথ্য	কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করি
আজকে আমার স্কুলে মোট কয়জন শিক্ষার্থী উপস্থিত আছে	শ্রেণিশিক্ষকগণের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য খুঁজে বের করাই হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ। আমরা নানা উপায়ে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকি। মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি, প্রযুক্তি ব্যবহার করেও আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। চিঠি, টেলিফোন ও মোবাইলের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। তাছাড়া কম্পিউটার, ট্যাব ও স্মার্টফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করেও আমরা নানারকমের তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।

৩. তথ্য সংরক্ষণ

মনে করি, গণিত ক্লাসে গণিত শিক্ষক কয়েকটি অঙ্ক বোর্ডে বা প্রজেক্টরে সমাধান করে দেখালেন। গণিত শিক্ষক অঙ্কের যে সমাধান করলেন তা হচ্ছে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য এই তথ্য আমরা অবশ্যই জমা করে রাখতে চাইব। তথ্য জমা করে রাখার এই কাজটিই হচ্ছে তথ্য সংরক্ষণ। তথ্য সংরক্ষণের এই কাজটি আমরা কাগজে বা খাতায় লিখে করতে পারি। আবার মনে করো, স্কুল থেকে শিক্ষা সফরে গিয়ে আমরা সহপাঠীদের নিয়ে অনেক আনন্দ করলাম। আনন্দের এই স্মৃতিগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এই স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য আমরা ক্যামেরা বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ছবি তুলি বা ভিডিয়ো করে রাখি। চলো, আর কী কী উপায়ে তথ্য সংরক্ষণ করা যায়, তা খুঁজে বের করি।

কী কী উপায়ে তথ্য সংরক্ষণ করা যায়?

কাজ: তথ্য সংরক্ষণের উপায় শনাক্ত করা

যা করতে হবে:

১. দৈনন্দিন জীবনে আমরা সাধারণত যেসব তথ্য সংরক্ষণ করি, তা সংরক্ষণের উপায় নিচের ছকে লিখি।

তথ্য	তথ্য সংরক্ষণের উপায়
গণিত শিক্ষকের অঙ্কের সমাধান	কাগজে বা খাতায় লিখে, ছবি তুলে
ছোটো ভাইয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠান	
বন্ধুর কবিতা আবৃত্তি	
ক্লাসের রুটিন	
ইমেইলে পাঠানো বড়ো ফাইল	
পুরানো ছবি	

সারসংক্ষেপ

তথ্য সংরক্ষণের জন্য বর্তমানে আমরা বিভিন্ন ডিভাইস ব্যবহার করি, যেমন– ক্যামেরা, কম্পিউটার, ট্যাব, মোবাইল ফোন, পেনড্রাইভ, সিডি, ডিভিডি, মেমোরি কার্ড, হার্ডডিস্ক ইত্যাদি।

তথ্য সংরক্ষণ সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

আমরা যদি তথ্য সংরক্ষণ না করি তবে পরে তা ভুলে যেতে পারি। তথ্য হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে তখন বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করার জন্য তথ্য পাওয়া কঠিন হয়। তাই সময়মতো তথ্য সংরক্ষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনো কাজ সুন্দর ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করতে, ইতিহাস জানতে, অতীত থেকে শিক্ষা নিতে এবং বিভিন্ন গবেষণার কাজে তথ্যের প্রয়োজন হয়। সুনির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়। সঠিক ও কার্যকর সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তথ্য সংগ্রহের পর তা নিরাপদে সংরক্ষণ করতে হয়।

৪. তথ্য বিনিময়

তথ্যের সঠিক ব্যবহার বলতে বোঝায় যথাযথভাবে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিময় করা। ইতোমধ্যে আমরা তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে জেনেছি। এই পাঠে আমরা তথ্য বিনিময় সম্পর্কে জানব।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য আদানপ্রদানই হলো তথ্য বিনিময়। তথ্য সঠিকভাবে বিনিময় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিকভাবে তথ্য বিনিময় আমাদের নিরাপদ থাকতে, ভালোভাবে বাঁচতে এবং বিপদ থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে।

আমরা কোন কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য বিনিময় করে থাকি?

কাজ: তথ্য বিনিময়ে ব্যবহৃত প্রযুক্তিসমূহ শনাক্ত করা

যা করতে হবে:

১. উপরের চিত্রগুলো ভালোভাবে লক্ষ করি।

২. দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য বিনিময় করি সেগুলো নিচের ছকে লিখি।

তথ্য বিনিময়ে ব্যবহৃত প্রযুক্তি	
১. চিঠি	৪.
২.	৫.
৩.	৬.

সারসংক্ষেপ

তথ্য বিনিময় বলতে তথ্য আদানপ্রদানকে বুঝায়। তথ্য বিনিময় হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য মানুষের সাথে তথ্য আদানপ্রদান করা হয়। আধুনিক যুগে তথ্য বিনিময়ের জন্য আমরা প্রযুক্তি ও ডিভাইস ব্যবহার করি।

তথ্য বিনিময় সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

প্রাচীনকালে মানুষ ছবি আঁকা বা কথা বলার মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদান করত। অনেক দূরে থাকা মানুষকে চিঠি পাঠিয়ে বা নিজে উপস্থিত হয়ে তথ্য বিনিময় করত। কবুতরের সাহায্যে বার্তা পাঠিয়ে, ঢোল বাজিয়ে অথবা ধোঁয়ার সংকেত দিয়েও মানুষ বিভিন্ন তথ্য বিনিময় করত। আধুনিক যুগে দূরের মানুষের সাথে কথা বলার জন্য আমরা টেলিফোন ও মোবাইল ফোন ব্যবহার করি। চিঠি লিখে, টেলিগ্রাফে বার্তা পাঠিয়ে, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এসএমএস (খুদে বার্তা) এবং ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে ই-মেইল পাঠিয়ে আমরা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তুলে বা ভিডিয়ো করে আমরা তথ্য বিনিময় করতে পারি। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে আমরা তথ্য আদানপ্রদান করে থাকি।

তথ্য সঠিকভাবে বিনিময় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তথ্য বিনিময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। “দেশে আগামী বছর ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়তে পারে”— এই তথ্যটি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হলে মানুষ আগেই ডেঙ্গুর বিস্তার সম্পর্কে সচেতন হবে। এতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে যাবে। শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নতির জন্য শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যে তথ্য যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কৃষকের চাষাবাদ, শ্রমিকের কলকারখানার কাজ, ডাক্তারের রোগব্যাধি ও চিকিৎসা ইত্যাদি নানারকম কাজের জন্য তথ্য বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব

আমরা নিশ্চয়ই স্মার্ট ফোন বা মোবাইল ফোন দেখেছি। মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে তা ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন কাজ করতে পারি। যেমন– কথা বলা, ছবি তোলা, খুদে বার্তা (এসএমএস) পাঠানো, ঘরে বসে পরীক্ষার ফলাফল জানা, ভিডিয়ো করা, বই পড়া, গেম খেলা, গান শোনা, আপলোড ও ডাউনলোড করা, সময় ও তারিখ জানা, স্ক্রিনশট নেয়া, ই-মেইল পাঠানো ইত্যাদি কাজ সহজেই করতে পারি। অর্থাৎ স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে আমরা নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে পারি–

১. তাৎক্ষণিক যোগাযোগ (কথা বলা, খুদে বার্তা পাঠানো, ই-মেইল পাঠানো)

২. তথ্য সংগ্রহ (কথা বলা, ছবি তোলা, ভিডিয়ো করা, ডাউনলোড করা, ঘরে বসে পরীক্ষার ফলাফল জানা)

৩. তথ্য সংরক্ষণ (ছবি তোলা, ভিডিয়ো করা, ডাউনলোড করা, স্ক্রিনশট নেয়া)

৪. তথ্য বিনিময় (খুদে বার্তা পাঠানো, আপলোড ও ডাউনলোড করা)

৫. বিনোদন (ভিডিয়ো করা, গেম খেলা, গান শোনা)

৬. ডিজিটাল সেবা (ব্যাংকিং লেনদেন, স্কুলের বেতন ও বিভিন্ন পরিষেবার বিল পরিশোধ, অনলাইনে কেনাবেচা)

মোবাইল ফোন ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্র বা প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা উল্লিখিত এক বা একাধিক কাজ সম্পন্ন করতে পারি।

প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কী কী কাজ করা হয়?

কাজ: বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার শনাক্ত করা

যা করতে হবে:

১. নিচের ছকটি টিক (√) ও ক্রস (×) চিহ্ন দ্বারা পূরণ করি।

প্রযুক্তির নাম	যোগাযোগ করা যায়	তথ্য সংগ্রহ করা যায়	তথ্য সংরক্ষণ করা যায়	তথ্য বিনিময় করা যায়
স্মার্ট ফোন	√	√	√	√
টেলিফোন				
টেলিভিশন				
কম্পিউটার				

তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্য বিনিময়ের জন্য বিভিন্ন যন্ত্র বা প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার– এসব কিছু মিলেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি রয়েছে। যেমন– রেডিয়ো, টেলিভিশন, টেলিফোন, ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সংক্ষেপে আইসিটি বলা হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নানাবিধ ব্যবহার থেকেই আমরা বুঝতে পারি এর গুরুত্ব কত বেশি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব কী?

কাজ: আমাদের জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব শনাক্ত করা।

যা করতে হবে:

১. উপরের চিত্রগুলো ভালোভাবে লক্ষ করি।

২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কীভাবে আমাদের জীবনের জন্য সহায়ক তা শনাক্ত করতে ছকটি পূরণ করি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নাম	ব্যবহার

সারসংক্ষেপ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যোগাযোগ করা খুবই সহজ ও সাধারণ ব্যাপার। আমরা এখন ঘরে বসে টেলিভিশনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের খবর জানতে পারি। সেই সাথে দূরদূরান্তের অনেক মানুষের সাথে যোগাযোগ করার জন্য এখন আর কোনো স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বরং আমাদের হাতে থাকা স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের মানুষের সঙ্গে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারছি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ফলে আমাদের জীবন আগের তুলনায় অনেক বেশি সহজ, সুন্দর ও আরামদায়ক হয়েছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আরও উন্নত হচ্ছে এবং এর ব্যবহারও বাড়ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বর্তমানে আমাদের জীবনে মানসম্মত কর্মসম্পাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এটি শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন, ব্যবসা, কৃষি, অর্থনীতি, শিল্প-সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অসংখ্য কম্পিউটারকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে তথ্য আদান প্রদান করার পদ্ধতিকে ইন্টারনেট বলা হয়। ইন্টারনেট তথ্য সংগ্রহের এক বিশাল ভান্ডার। দুনিয়ার এমন কোনো বিষয় নেই যেগুলো সম্পর্কে ইন্টারনেটে তথ্য পাওয়া যাবে না। মানুষ ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে যেকোনো জায়গা থেকে তথ্য আদানপ্রদান করতে পারে এবং যোগাযোগ করতে পারে।

৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার

দৈনন্দিন জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কী কী অপব্যবহার লক্ষ করা যায়?

তথ্য আদানপ্রদানের সময় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যেমন– অপরিচিত ব্যক্তির মিথ্যা তথ্য বিশ্বাস করে আমাদের পরিবার দুশ্চিন্তা, আর্থিক ক্ষতিসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই অপরিচিত ব্যক্তির তথ্য বিশ্বাস করার আগে তা ভালোভাবে যাচাই করা প্রয়োজন।

তাছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার থেকে দূরে থেকে এর নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। যেমন– অতিমাত্রায় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা, শিক্ষক অথবা অভিভাবকের অনুমতি, সহযোগিতা ও পরামর্শ ছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহার না করা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ডিভাইসগুলোর যত্ন নেওয়া এবং সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা এড়ানো এবং নিরাপদ থাকা যেতে পারে।

কাজ ১: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার শনাক্ত করা

যা করতে হবে:

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যেসব অপব্যবহার হয় তা দলে আলোচনা করে নিচের ছকে লিখি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নাম	অপব্যবহার

২. দলের কাজ শ্রেণিতে উপস্থাপন করি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

সারসংক্ষেপ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিমিত ও যৌক্তিক ব্যবহার আমাদের জীবনকে যেমন সহজ ও সুন্দর করে, তেমনি এর অপব্যবহার জীবন যাপনে ব্যাঘাত ঘটায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বর্তমান যুগে প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যোগাযোগ করা খুবই সহজ ও সাধারণ ব্যাপার। ইন্টারনেট ব্যবহার করে মুহূর্তের মধ্যে যেকোনো তথ্য আদানপ্রদান করা সম্ভব। প্রাপ্ত তথ্য সঠিক ও নির্ভরযোগ্য কি না, ভুল জায়গায় তথ্য পাঠানো হচ্ছে কি না, গোপনীয় তথ্য অসৎ বা মন্দ লোকের কাছে চলে যাচ্ছে কি না– এসব বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে তথ্য আদানপ্রদান নিরাপদ নয়। তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এসব মাধ্যম থেকে ব্যক্তিগত ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ঘটছে। ভুল তথ্যের কারণে ব্যক্তি, পরিবার বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে, এক ধরনের নেশা বা আসক্তি তৈরি হতে পারে। শিশুদের সার্বিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

? তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের জন্য কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে পারি?

কাজ ২: তথ্য আদানপ্রদানের নিরাপদ ব্যবহার শনাক্তকরণ।

যা করতে হবে:

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার নিয়ে নিচের ছকটি পূরণ করি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	নিরাপদ ব্যবহারের জন্য আমরা কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে পারি
টেলিফোন	অপরিচিত ব্যক্তির তথ্য যাচাই করা, অপরিচিত ব্যক্তিকে গোপনীয় তথ্য না দেয়া ইত্যাদি।

সারসংক্ষেপ

শিশুদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিভাবক বা শিক্ষকগণের অনুমতি ও নির্দেশনা নেয়া উচিত। প্রযুক্তি ব্যবহারে আমরা যেন আসক্ত না হয়ে পড়ি, সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

আজকাল সব ধরনের তথ্যের জন্য আমরা ইন্টারনেটসহ আরও অনেক প্রযুক্তির উপর নির্ভর করি। কিন্তু ইন্টারনেটের সব তথ্যই সঠিক নয়। অনেকেই অনিচ্ছাকৃতভাবে বা অনেকে ইচ্ছা করে ভুল বা মিথ্যা তথ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মিথ্যা তথ্য প্রচার করার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। কাজেই ইন্টারনেট থেকে নেয়া তথ্য সব সময়ই যাচাই করে নিতে হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে কীভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তা আগে থেকে জানতে হবে। বড়োদের কাছ থেকে অনলাইন নিরাপত্তার কৌশল ভালোভাবে শিখতে হবে। কোনো ধরনের সন্দেহজনক কার্যকলাপ দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ কারও সাহায্য নিতে হবে। অনলাইনে অপরিচিত কারও সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে। ভালোভাবে না জেনে কাউকে অনলাইনে বন্ধু করা যাবে না।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অনেক ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও এর অপব্যবহার গ্রাস করছে শিক্ষার্থীদেরকে। শিক্ষার্থীরা তাদের মূল্যবান সময়ের একটি বড়ো অংশ মোবাইল বা কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকছে। তারা মাত্রাতিরিক্ত গেমস খেলছে, ভিডিয়ো দেখছে ও চ্যাটিং করছে। এই অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এসবের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সঠিক ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে আমাদের সচেতন ও সতর্ক হতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষতিকর সবকিছু থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে আমরা সুস্থ, সুন্দর ও উন্নত জীবন গড়ে তুলতে পারি।

অনুশীলনী

১. শূন্যস্থান পূরণ করি।

ক) বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য জোগাড় করার কাজই হচ্ছে ----------।

খ) চিঠি হচ্ছে ---------- বিনিময়ের প্রযুক্তি।

গ) ইন্টারনেট ব্যবহার করে মুহূর্তের মধ্যে যেকোনো তথ্য ---------- সম্ভব।

২. বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশ মিলাই।

মাত্রাতিরিক্ত গেমস খেলা	তথ্য সংরক্ষণ
তথ্য আদানপ্রদান ও যোগাযোগ	তথ্য সংগ্রহের এক বিশাল ভান্ডার
ইন্টারনেট	ডিজিটাল সেবা
ছবি তোলা, ভিডিয়ো করা, স্ক্রিনশট নেয়া	ফেসবুক, এক্স, ইমো
ব্যাংকিং লেনদেন, অনলাইনে কেনাবেচা	শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি

৩. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিই।

১) কোনটি তথ্যের উৎস নয়?

ক) টেলিভিশন খ) সংবাদপত্র

গ) বই ঘ) কলম

২) কোনটি তথ্য বিনিময়ের প্রাচীনতম প্রযুক্তি?

ক) চিঠি খ) টেলিগ্রাফ

গ) কবুতর ঘ) মোবাইল

৩) শেলি মাঝে মাঝে একটি ফেসবুক গ্রুপে পড়াশোনা করে। গ্রুপের একজন অপরিচিত সদস্য একদিন তার বাসার ঠিকানা জানতে চাইল। শেলির কী করা উচিত?

ক) বাসার ঠিকানা দিয়ে দেওয়া খ) শুধু মোবাইল নম্বর দেওয়া

গ) বিষয়টি অভিভাবককে জানানো ঘ) ফেসবুক গ্রুপ ত্যাগ করা

৪. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক) তথ্য বিনিময় বলতে কী বোঝায়?

খ) তথ্য সংরক্ষণের জন্য কোন কোন ডিভাইস ব্যবহৃত হয়?

৫. বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব কী?

খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের জন্য কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন?

অধ্যায় ১১

সমস্যা সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হই। কিছু সমস্যা নিয়মিত আবার কিছু সমস্যা অনিয়মিত। সমস্যা যেমন আছে, তেমনি সমস্যার সমাধানও আছে। বর্তমান যুগে সমস্যা সমাধানে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। ফলে অনেক কম সময়ে, সহজেই সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে।

১. সমস্যা সমাধানের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা

সমস্যা সমাধানের শুরুতেই আমরা সাধারণত পরিকল্পনা করি। পরিকল্পনা হচ্ছে কোনো ব্যাপারে কী করা যেতে পারে সে সম্পর্কে আগে থেকে ভেবে রাখা। অর্থাৎ পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়। যেমন- লেখাপড়া বিষয়ে কোনো সমস্যা হলে আমরা সাধারণত শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব বা পরিবারের সদস্যদের কাছে সহযোগিতা নেওয়ার পরিকল্পনা করি।

? দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে কীভাবে পরিকল্পনা করবো?

কাজ: দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা প্রণয়ন।

যা করতে হবে-

১. দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেসব সমস্যায় পড়ি এবং তা নিয়ে চিন্তা করি। সমস্যাগুলো হতে একটি সমস্যা বাছাই করি।

১. বাছাইকৃত সমস্যাটি কীভাবে সমাধান করা যায় তার পরিকল্পনা নিচের ছকে লিখি।

সমস্যা	সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

সারসংক্ষেপ

পরিকল্পনা হচ্ছে কোনো সমস্যা সমাধানে কী করা যেতে পারে সে সম্পর্কে আগে থেকে ভেবে রাখা। অর্থাৎ পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়। দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হই। পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে কোনো সমস্যা সমাধান করা যায়।

২. সমস্যা সমাধানের ধাপসমূহ

যে কোনো কাজ করার জন্য বা সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা পরিকল্পনা করে থাকি। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য আমরা ধারাবাহিকভাবে কিছু নিয়ম মেনে চলি।

সমস্যা সামাধানের ধাপসমূহ কী কী?

কাজ: সমস্যা সামাধানের ধাপসমূহ চিহ্নিতকরণ।

যা করতে হবে-

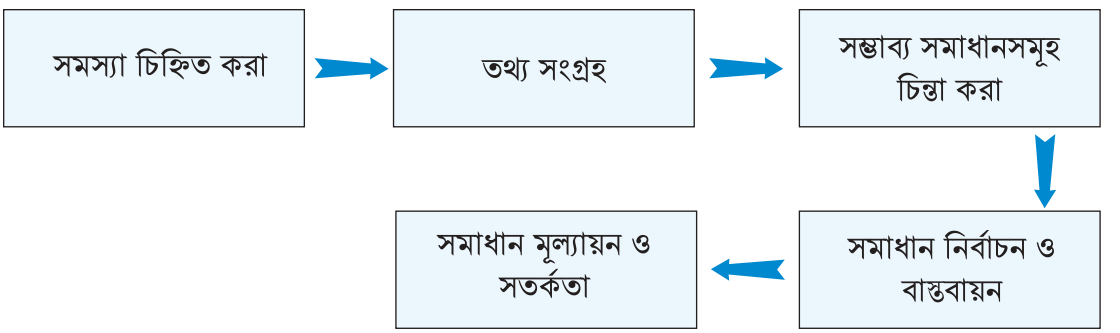

১. উপরে সমস্যা সমাধান সম্পর্কিত প্রবাহচিত্রটি ভালোভাবে লক্ষ করি।

২. বিদ্যালয়ের বাগানের ফুল গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে– এই সমস্যা সমাধানের জন্য কী কী কাজ করতে হবে, তার একটি তালিকা প্রবাহচিত্র অনুসারে নিচের ছকে লিখি।

১।
২।
৩।
৪।
৫।

সারসংক্ষেপ

কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য ধারাবাহিকভাবে কতগুলো কাজের ধাপ অনুসরণ করতে হয়।

যৌক্তিক নির্দেশনায় সমস্যার সমাধান

? ধারাবাহিক নির্দেশনা বা কোড অনুসরণ করে কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়?

কাজ: ছক্কা দিয়ে শতক ছোঁয়া

যা করতে হবে-

১। নিচের ছবির মতো গোল হয়ে বসি ।

২। দলে একটি ছক্কা নিই।

৩। একজন সহপাঠীকে খেলায় অংশগ্রহণকারীদের নাম ও প্রাপ্ত নম্বর লেখার দায়িত্ব দিই।

৪। পর্যায়ক্রমে একজন একজন করে ছক্কা নিক্ষেপ করি।

৫। নিক্ষিপ্ত ছক্কায় সংখ্যাটি উঠবে সেই সংখ্যা অথবা তার ১০ গুণ নম্বর ছক্কা নিক্ষেপকারীর নির্দেশনা অনুসারে তার নামের পাশে লিখি।

৬। এভাবে প্রত্যেকে ৫ বার করে ছক্কা নিক্ষেপের সুযোগ পাবে।

৭। প্রত্যেকের ৫ বারের ছক্কা নিক্ষেপের প্রাপ্ত নম্বর যোগ করি।

৮। যার নম্বর সবার আগে ১০০ অথবা এর কাছাকাছি হবে তাকে বিজয়ী ঘোষণা করি।

খেলাটি শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে আমরা খেলতে পারি।

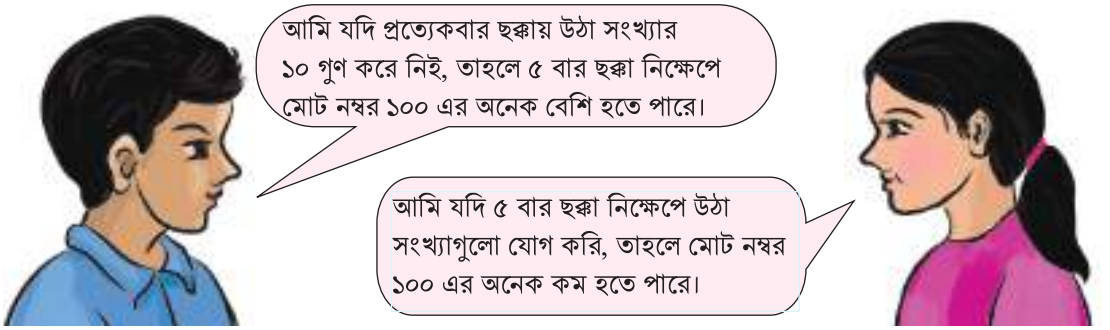

আলোচনা

শতক ছোঁয়া খেলায় বিজয়ী খেলোয়াড় কী কৌশল অবলম্বন করেছে?

১। এই খেলায় বিজয়ী হওয়ার জন্য কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়েছে ?

২। বিজয়ী হওয়ার কৌশল নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

সারসংক্ষেপ

শতক ছোঁয়া খেলায় আমরা বুঝতে পেরেছি যে, যৌক্তিক নির্দেশনা অনুসরণ করে সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় অর্থাৎ সমস্যার সমাধান করা যায়।

৩. তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাধারণ সমস্যা সমাধান (স্ক্র্যাচ পরিচিতি)

কোনো কাজ করার সময় কম্পিউটার বা কোনো যন্ত্র কতগুলো ধারাবাহিক নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে। কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনে কতগুলো ধারাবাহিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে অর্থাৎ কোড বা কমান্ড দিয়ে আমরা কোনো কাজ বা সমস্যার সমাধান করতে পারি। আমরা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কতগুলো নির্দেশনা ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করে কীভাবে সাধারণ সমস্যা সমাধান করা যায় সে সম্পর্কে জানবো।

? ব্লক-কোড ব্যবহার করে কীভাবে প্রোগ্রাম তৈরি করতে হয়?

কাজ: খন্ড জুড়ে পূর্ণ করি।

যা করতে হবে-

১। অপর পৃষ্ঠার খন্ডগুলো যৌক্তিকভাবে সাজিয়ে শহিদ মিনারটি তৈরি করি।

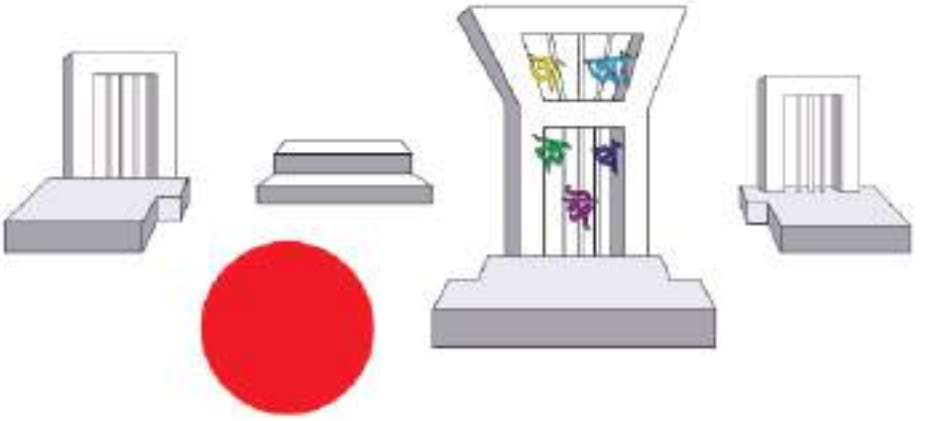

২। কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি ।

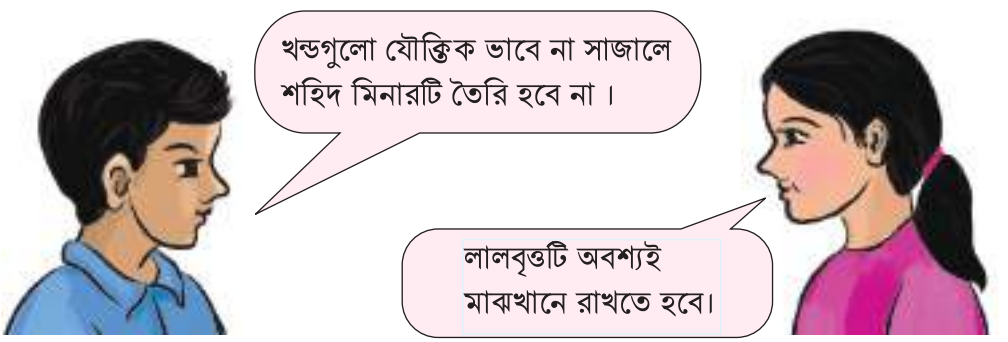

আলোচনা

নিচের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করি।

১। নির্দিষ্ট ক্রমে না সাজিয়েও কি আমরা শহিদ মিনারটি তৈরি করতে পারতাম ? মতের পক্ষে যুক্তি দিই।

২। বিষয়টি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি ।

সারসংক্ষেপ

আমরা দেখেছি, কোন একটি বস্তু বা বিষয়ের ছোট ছোট খন্ড যুক্ত করে সম্পূর্ণ বস্তু বা বিষয় তৈরি করা যায়। যেমন- ছবির বিভিন্ন খন্ড যৌক্তিকভাবে সাজিয়ে শহিদ মিনারের সম্পূর্ণ ছবিটি তৈরি করা হয়েছে। এই কাজটি আমরা যন্ত্রের মাধ্যমেও করতে পারি। কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে এধরনের কাজ করা যায়। একাজ করার জন্য আমরা কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে পারি।

স্ক্র্যাচের পরিচিতি

শিশুদের ব্লক-কোড ভিত্তিক একটি জনপ্রিয় **প্রোগ্রাম** হলো স্ক্র্যাচ । এই প্রোগ্রামটি চালু করার জন্য ইন্টারনেট সংযোগসহ একটি কম্পিউটারের প্রয়োজন হয়। এই প্রোগামের মাধ্যমে আমরা ব্লক-কোড ধারাবাহিকভাবে টেনে ও জোড়া লাগিয়ে খুব সহজেই কম্পিউটার, ট্যাব বা মোবাইল ফোন দিয়ে নানান ধরনের খেলা, **এনিমেশন ভিডিও,** ছবি ইত্যাদি তৈরি করতে পারি। স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামে **স্প্রাইট** ও **দৃশ্যপট** নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্লক-কোড ব্যবহার করা হয়। স্প্রাইট হলো স্ক্র্যাচের একটি কার্টুন চরিত্র। স্ক্র্যাচে কাজ করার সময় প্রয়োজনমতো নানা রকম স্প্রাইট ও দৃশ্যপট ব্যবহার করা হয়।

স্প্রাইট ও দৃশ্যপট

স্ক্র্যাচে প্রবেশ ও ভাষা পরিবর্তন

কম্পিউটারের **ওয়েব ব্রাউজার** খুলে scratch.mit.edu লিখে Scratch ওয়েব সাইটে প্রবেশ করি। Scratch ওয়েব সাইটটি দেখতে অপর পৃষ্ঠার ছবির মতো। এটিই হলো স্ক্র্যাচের হোম পেইজ। এই ছবির তীর চিহ্ন দেওয়া স্থানে ক্লিক করে আমরা ভাষা পরিবর্তন করে বাংলা ভাষায় স্ক্র্যাচ প্রোগ্রাম শুরু করতে পারি।

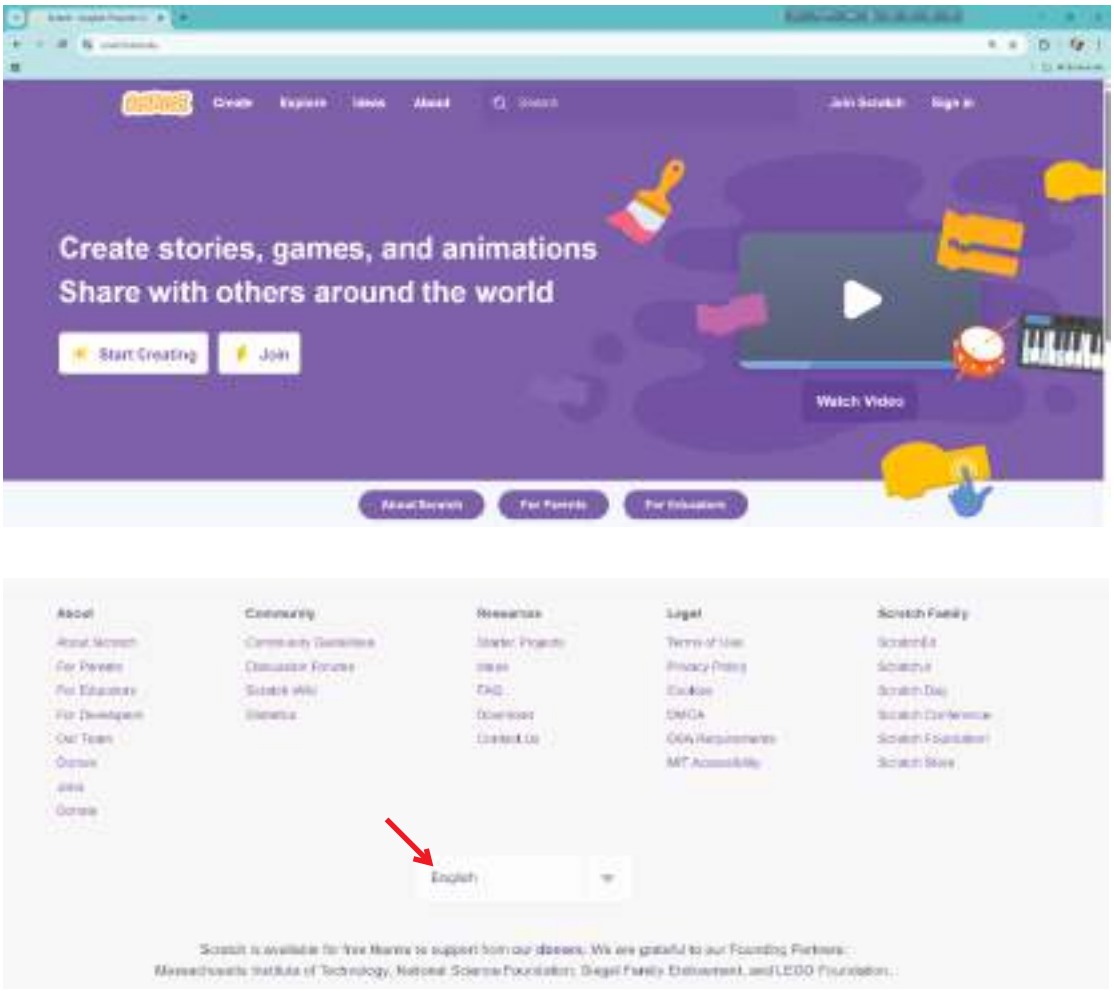

স্ক্র্যাচ হোম পেইজ

স্ক্র্যাচের বিভিন্ন উপাদান

স্ক্র্যাচের নতুন প্রোগ্রাম তৈরির জন্য বাংলা ভাষার হোম পেইজের উপরের অংশে '**তৈরি কর**' এর উপর ক্লিক করি।

ক্লিক করার পরে নিচের ছবির মতো **স্ক্র্যাচের এডিটর**টি দেখা যাবে। এডিটরের তিনটি অংশ বা উপাদান রয়েছে। যেমন- কোড এলাকা, স্ক্রিপ্ট এলাকা, স্টেজ বা মঞ্চ।

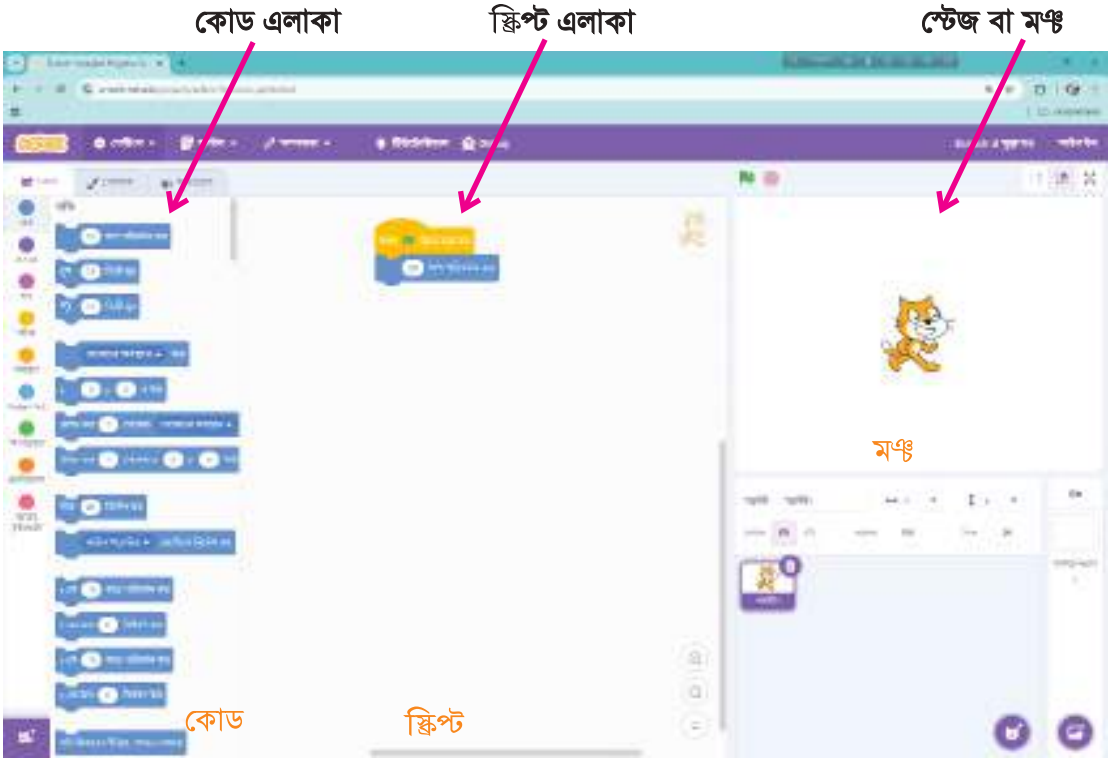

স্ক্র্যাচ এডিটর

স্ক্র্যাচ এডিটরের বামপাশের অংশ কোড এলাকা যেখানে নানান ধরনের ব্লক-কোড থাকে । ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রঙের ব্লক-কোড ব্যবহার করা হয়। নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য এডিটরের মাঝখানে **স্ক্রিপ্ট** এলাকায় বিভিন্ন ব্লক-কোড পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়। স্ক্রিপ্ট এলাকায় সাজানো ব্লক-কোড অনুযায়ী কাজটি এডিটরের একেবারে ডানপাশে **মঞ্চে** দৃশ্যমান হয় ।

ব্লক-কোড এর পরিচিতি

স্ক্র্যাচে মোট নয় ধরনের ব্লক-কোড রয়েছে। কাজের ধরন অনুযায়ী এগুলোর রং ও আলাদা। ফলে একটি ব্লক-কোডের রং দেখেই বোঝা যায় সেটি কী কাজ করে । অপর পৃষ্ঠার ছকে ব্লক-কোডগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো ।

বর্ণনাসহ ব্লক-কোড এর তালিকা

ব্লক-কোড এর		বর্ণনা
১	গতি (Motion)	স্প্রাইটের গতি ও অবস্থান পরিবর্তন সংক্রান্ত
২	চেহারা (Looks)	স্প্রাইটের বিভিন্ন ভঙ্গি ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ
৩	শব্দ (Sound)	বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার
৪	ঘটনা (Events)	বিভিন্ন ধরনের ঘটনা অনুযায়ী কার্যক্রম নির্ধারণ

৫	নিয়ন্ত্রণ (Control)	বিভিন্ন শর্ত যাচাই ও পুনরাবৃত্তির (লুপ) ব্যবহার
৬	অনুভব করা (Sensing)	ক্লিক, স্পর্শ ইত্যাদি অনুভবের সাথে সম্পর্কিত কাজ নির্ধারণ
৭	অপারেটর (Operators)	গাণিতিক অপারেশন এবং বিভিন্ন মানের তুলনা
৮	চলক বা ভ্যারিয়েবল (Variables)	ভ্যারিয়েবল, তালিকা এবং এগুলোর ব্যবহার
৯	আমার ব্লকগুলো (My Blocks)	নিজের প্রয়োজনমত নিজস্ব কাজ (ফাংশন) তৈরি করা

স্ক্র্যাচে প্রথম কাজ

আমরা জেনেছি যে, এডিটরের স্ক্রিপ্ট এলাকায় বিভিন্ন ব্লক-কোড পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে কোনো কাজ করা যায়। প্রথম কাজ হিসাবে স্ক্র্যাচে আমরা একটি স্প্রাইটকে কয়েক ধাপ সামনের দিকে নিয়ে যাবো।

কাজ: স্প্রাইটকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া।

যা করতে হবে-

১। স্ক্র্যাচ এডিটর চালু করি

২। এডিটর চালু করলে মঞ্চে একটি স্প্রাইট দেখতে পাবো।

৩। কোড এলাকা থেকে 'ঘটনা' ক্লিক করে ব্লক-কোডটি স্ক্রিপ্ট এলাকায় নিয়ে আসি।

৪। একই ভাবে 'গতি' ক্লিক করে ব্লক-কোডটি স্ক্রিপ্ট এলাকায় এনে পূর্বের ব্লক-কোডটির সাথে জুড়ে দিই।

৫। ব্লক-কোডটির সাদা অংশে ইচ্ছেমতো ধাপ সংখ্যা বসাই। যেমন- ।

৬। মঞ্চের উপরের দিকে সবুজ। পতাকায় ক্লিক করি।

৭। স্প্রাইটের চলাচল লক্ষ করি।

৮। কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করি।

সারসংক্ষেপ

আমরা জেনেছি যে, স্ক্যাচে বিভিন্ন ব্লক-কোড পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে নির্দিষ্ট কাজ করা যায়। এটিই হলো প্রোগ্রাম। পরবর্তী শ্রেণিতে আমরা যৌক্তিক নির্দেশনা মেনে ও ব্লক-কোড ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রোগ্রামিং করতে পারব।

অনুশীলনী

১. শূণ্যস্থান পূরণ করি।

ক) কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কাজের ---------- করতে হয়।

খ) স্ক্র্যাচের একটি কার্টুন চরিত্র হলো ---------- ।

গ) স্ক্রিপ্ট এলাকায় বিভিন্ন ---------- ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়।

২. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিলাই।

স্টেজ বা মঞ্চ	সমস্যা সমাধান
কোড এলাকা	যৌক্তিক নির্দেশনা
পরিকল্পনা	স্ক্র্যাচ এডিটরের বাম পাশের অংশ
ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ	স্ক্র্যাচ এডিটরের ডান পাশের অংশ

৩. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক) সমস্যা সমাধানের ধাপসমূহ কী কী?

খ) স্ক্র্যাচ কী?

৪. বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক) স্ক্র্যাচ এডিটরের কার্যাবলি বর্ণনা করি।

খ) স্প্রাইটকে কয়েক ধাপ সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কী করতে হবে?

শব্দকোষ

শব্দ	অর্থ
অক্সিজেন	এক প্রকার গ্যাস
অঙ্কুরোদ্‌গম	বীজ থেকে চারা জন্মানোর প্রক্রিয়া
উৎস	যেখান থেকে কিছু পাওয়া যায়
এনিমেশন ভিডিয়ো	স্থির চিত্রের মাধ্যমে তৈরি বিশেষ ধরনের ভিডিয়ো
ওয়েব ব্রাউজার	ইন্টারনেট জগতে তথ্য খুঁজে বের করার জন্য যে বিশেষ প্রোগ্রাম ব্যবহৃত হয়
কার্বন ডাইঅক্সাইড	এক প্রকার গ্যাস
গ্লাভস	হাতে পরার মোজা বা দস্তানা
ঘনীভবন	কোনো পদার্থ বাষ্প থেকে তরলে পরিণত হওয়া
চর্মরোগ	ত্বক বা চামড়ার রোগ।
জীববৈচিত্র্য	পৃথিবীতে বিদ্যমান নানা রকমের জীবজন্তু, গাছপালা ও ছোটো ছোটো প্রাণীর বৈচিত্র্য
জীবাণুনাশক	এমন বস্তু বা ঔষধ, যা জীবাণু ধ্বংস করে

জেনারেটর	বৈদ্যুতিক যন্ত্র যা বিদুৎ উৎপাদন করে
টারবাইন	একটি ঘূর্ণায়মান যন্ত্র যা পানি, বাষ্প, গ্যাস বা বায়ুপ্রবাহের শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে
ডায়াগ্রাম	জ্যামিতিক নকশা যা ব্যবহার করে কোন বিষয় উপস্থাপন করা যায়
ডিভাইস	যন্ত্র
নির্মল পরিবেশ	দূষণমুক্ত পরিবেশ
পরাগায়ন	পরাগরেণুর গর্ভমুন্ডে স্থানান্তরিত হওয়া
পক্ষাঘাত	শরীরের একপাশ কিংবা বিশেষ কোনো অংশ অবশ হয়ে যাওয়া রোগ
পিচুটি	চোখে জমে থাকা ময়লা, যা চোখে অস্বস্তি তৈরি করে
পিস্টন	একটি লোহার বা ধাতুর তৈরি যন্ত্রাংশ, যা গাড়ি বা মেশিনের ভেতর থাকে
পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ	ব্যবহৃত বা বর্জ্য পদার্থকে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য উপকরণে রূপান্তর করা
পূর্বাভাস	বর্তমান তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করে তথ্য দেওয়া
বংশগত রোগ	বাবা-মা বা পূর্বপুরুষদের থেকে সন্তানের শরীরে আসা রোগ
বাষ্পীভবন	কোনো পদার্থ তরল থেকে বাষ্পে পরিণত হওয়া

বাস্তুতন্ত্র	জীব ও তাদের পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়ার একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা
বায়ুমণ্ডল	পৃথিবীর চারপাশে ঘিরে থাকা বিভিন্ন গ্যাসের স্তর
বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট	অসাবধানতাবশত শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া
বিরূপ	প্রতিকূল পরিস্থিতি/ ক্ষতিকর
বিশেষজ্ঞ	বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী
মাদকাসক্তি	মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে যে আসক্তি সৃষ্টি হয়
রূপান্তরিত	এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হওয়া
শরীর স্পঞ্জ করা	গা মোছা
স্বাস্থ্যকর	স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী
স্থির	কোনো কিছুর থেমে থাকা অবস্থা
সৌরকোষ	সূর্যের আলো ব্যবহার করে বিদ্যুৎ তৈরির যন্ত্র

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি–বিজ্ঞান

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য